মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজিঃ নং- ১৪৫ বর্ষ-৩, সংখ্যা-০৪

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

মে ২০১৪ইং, রজব ১৪৩৫হিঃ, বৈশাখ ১৪২১বাং

رجب المرجب ١٤٣٥ مايو ٢٠١٤م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :........................... ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৪
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৫
মাওয়ায়েযে ফক্বীহুল মিল্লাত :
আসুন গুনাহমুক্ত জীবন গড়ি ৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ:
সত্যসন্ধানী লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি ভেবে দেখার আহ্বান... ৮
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৪....... ১৮
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
তাবলীগি কাজের সূচনা-২ .... ২১
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১...২৫
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী
'উমরী কাযা'-এর শরয়ী বিধান ৩১
মুফতি শরীফুল আজম
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৯
ইসলামে মানবাধিকার-৩ .... ৪৪
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ইমেইল :monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com

মোবাইলঃ প্রধান সম্পাদকঃ ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদকঃ০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদকঃ ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদকঃ ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধিঃ ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

মাহে রজব মাহে রহমতের প্রবেশদ্বার

মাহে রজব মুসলমানদের মাঝে নিয়ে আসে রামাজানুল মোবারকের আগমনী বার্তা। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের সে প্রবাহমান ঝর্ণায় স্নাত হওয়ার আহ্বান। বিগত দিনগুলোর বৈষয়িক ঝঞ্ঝাকাতর মুহূর্ত থেকে মুসলিম উম্মাহের উত্তরণের জন্যই মূলত এই সাদর আমন্ত্রণ।

আবহমান কাল থেকে যারা প্রতিবছর মহান আল্লাহর এই আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় দিন গুজরান করেন, মাহে রজবের প্রথম প্রহর থেকেই তাঁদের মন হয়ে ওঠে সতত ব্যাকুল। মাহে রামাজানের অসীম ফজীলত, তাসবীহ, তিলাওয়াত, ইবাদতের অসংখ্য সাওয়াব, সিয়াম সাধনার মহাপ্রতিদান, পবিত্র লাইলাতুল কদরের সাক্ষাৎ, তারাবীহ ও ইতিকাফের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের নেশায় তাঁরা যেন উৎফুল্ল-উচ্ছ্বসিত। জাগতিক সর্বপ্রকার মায়া-মমতা, কামনা-বাসনা, আবেদন-নিবেদন ত্যাগ করে তাঁরা যেন আজ এক নতুন সফরের অভিযাত্রী। আর তাই হলো মাহে রামাজানের জন্য আগাম প্রস্তুতি।

হাদীস শরীফে এসেছে–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থাৎ রজব মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদের বরকত দান করো এবং আমাদেরকে রামাজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।'

(মুসনাদে আহমদ ১/৩৩৯, মেশকাত ১২১, বাইহাকী শুআবুল ঈমান ৩/৩৭৫)

মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'রজব ও শা'বানে আমাদের ইবাদত-বন্দেগীতে বরকত দান করো এবং রামাজানের পূর্ণ এক মাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিয়াম ও কিয়াম তথা রোজা ও তারাবীহর তাওফীক দান করো।' (মেরকাত ৩/৪৬৩)

মাহে রামাজানে প্রবেশের প্রধান ফটক হচ্ছে রজব মাস। পার্থিব জীবনে যেমন শাহী মহলের প্রধান ফটকে পৌঁছে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া হয়, তদ্রূপ রজব মাস থেকেই রামাজানের রহমত ও বরকত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট বান্দাগণ রজব থেকে সিয়াম সাধনার প্রস্তুতি আরম্ভ করতেন। ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) তাঁর "লাতায়েফুল মা'আরেফ" গ্রন্থে কবিতার ভাষায় এ প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছেন–

بيض صحيفتك السوداء فى رجب
بصالح العمل المنجى من اللهب
شهر حرام اتى من اشهر حرم
اذا دعا الله داع فيه لم يخب
طوبى لعبد زكى فيه له عمل
فكف فيه عن الفحشاء والريب

'জীবনের কালো অধ্যায়গুলো রজব মাসে তাওবা-ইস্তিগফার ও নেক আমলের মাধ্যমে মুছে ফেল। আশহুরে হুরুমের অন্যতম এ মাসে আল্লাহকে ডেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। পুণ্যবান ওই ব্যক্তি, যে এ মাসে বেশি বেশি আমল করে। কাজেই এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।'

অতএব এই রজব মাসেই গুনাহের ময়লায় কলুষিত আমলনামাকে তাওবার শুভ্র শলীলে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

আবুবকর ওয়াররাক বালাখী (রহ.) বলেন, রজব মাস ফসল রোপণের মাস। শা'বান মাস ফসলে পানি সেচ দেওয়ার মাস আর রামাজান মাস হলো ফসল ঘরে তোলার মাস। তিনি আরো বলেন, রজব মাস ঠাণ্ডা বাতাসের মতো, শা'বান মাস মেঘমালার মতো আর রামাজান মাস হলো বৃষ্টির মতো। (লাতায়েফুল মা'আরেফ ১৪৩)

দারুল উলূম দেওবন্দের মুরব্বিগণ মাহে রামাজানের সিয়াম সাধনার প্রস্তুতি হিসেবে রামাজানের পূর্বেই শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি ঘটান। আবার রামাজান শেষে শাওয়াল থেকে শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ করেন। আরবী প্রথম মাস মুহাররম অথবা ইংরেজি প্রথম মাস জানুয়ারিতে শিক্ষাবর্ষ আরম্ভ না করে ব্যতিক্রম পদ্ধতি চালু করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো রামাজানকে ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত রাখা। রুহানি শক্তি অর্জন ছাড়া শুধু কিতাবী ইলম মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য করতে পারে না। এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তাঁরা উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

সুতরাং মাহে রামাজানে রিয়াযাত মুজাহাদার জন্য আমাদের এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এটাই উপযুক্ত সময়।

আরশাদ রাহমানী
ঢাকা।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ

আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নি ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোনো রাসূলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রতিটি ওয়াদা লিখিত আছে। (সূরা রা'আদ ৩৮)

নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাঁদের মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে। কুরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুওয়াত রিসালাতের স্বরূপ ও রহস্যই বোঝনি। ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা একটি আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতোই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলাবাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয়, এরূপ কোনো অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তি উত্থাপিত হলো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এর জবাবে আরেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজনবিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোন প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়াত ও রিসালাতের পরিপন্থী মনে করে নিয়েছ? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকে পরিবার-পরিজনবিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গম্বর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুওয়াতের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুওয়াত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি। (অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব)। তিনি আরও বলেন, আমি রাতে নিদ্রাও যাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই। (অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব) এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ

অর্থাৎ কোনো রাসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন।

কাফির ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবি পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রাসূল (সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবি করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এক, আল্লাহর কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধিবিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনূসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে,

ائت بقران غير هذا او بدله অর্থাৎ আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিন। আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই, পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মুজিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মুজিযা দাবি করে বলা হলো যে, এমন ধরনের মুজিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কুরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যে آية শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মুজিযাকেও। এ কারণেই এ আয়াত শব্দের ব্যাখ্যা কোনো কোনো তাফসীরবিদ কুরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত তৈরি করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মুজিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো রাসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা যে ধরনের ইচ্ছা মুজিযা প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে عموم مجاز এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তাফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবি অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোনো রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দিইনি। এমনিভাবে কোনো বিশেষ ধরনের মুজিযা দাবি করাও নবুওয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মুজিযা প্রদর্শন করবেন।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

নিজের প্রয়োজন মানুষের কাছে নয়, আল্লাহর কাছে পেশ করা :

عن ابن مسعودؓ قال قال رسول الله ﷺ من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغناء اما بموت عاجل او غنى اجل (رواه ابو داؤد والترمذى)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির কোনো অভাব-অনটন দেখা দিল আর সে এটা মানুষের সামনে পেশ করল (এবং তাদের কাছে সাহায্য চাইল) তার এ অভাব দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি এটা আল্লাহর সামনে পেশ করল, খুবই আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার এ অভাব দূর করে দেবেন। হয়তো দ্রুত মৃত্যু দিয়ে (যদি তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গিয়ে থাকে) অথবা কিছু বিলম্বে সচ্ছলতা দান করে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

সওয়ালে সর্বাবস্থায়ই অপমান রয়েছে :

عن عمر ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسئلة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة (رواه البخارى ومسلم)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন দান-খয়রাত করতে এবং সওয়াল থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। আর উপরের হাত হচ্ছে দানের হাত এবং নিচের হাত হচ্ছে ভিক্ষার হাত। (বুখারী ও মুসলিম)

যে পর্যন্ত পরিশ্রম করে করে জীবিকা অর্জন করা যায়, সে পর্যন্ত সওয়াল করতে নেই :

عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله ﷺ لان يأخذ احدكم حبله فياتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه (رواه البخارى)

হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কোনো (অভাবী) মানুষের এ কাজটি যে, সে রশি নিয়ে জঙ্গলে যাবে এবং পিঠে লাকড়ির বোঝা বহন করে এনে বিক্রি করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা সওয়ালের লাঞ্ছনা থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এটা তার জন্য ওই কাজ অপেক্ষা অনেক ভালো যে, সে মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে। তারপর তারা তাকে কিছু দেবে অথবা না করে দেবে। (বুখারী)

সওয়াল করতে বাধ্য হলে আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা :

عن ابن الفراسى ان الفراسى قال قلت لرسول الله ﷺ اسأل يا رسول الله؟ فقال النبى ﷺ لا وان كنت لابد فسل الصالحين (رواه ابو داؤد والنسائى)

তাবেয়ী ইবনুল ফারাসী থেকে বর্ণিত, ফারাসী (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার প্রয়োজনে মানুষের কাছে সওয়াল করব? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (যতদূর সম্ভব) সওয়াল করতে যেয়ো না। আর যদি কোনো উপায়ান্তর না থাকে, তাহলে আল্লাহর নেক বান্দাদের কাছে সওয়াল করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ দান ও এর বরকত :

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ قال الله تعالى انفق يابن ادم انفق عليك (رواه البخارى ومسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার অভাবী বান্দাদের ওপর) নিজের উপার্জন থেকে খরচ করো, আমি আপন ভাণ্ডার থেকে তোমাকে দিতে থাকব। (বুখারী ও মুসলিম)

عن اسماء قالت قال رسول الله ﷺ انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت (رواه البكارى ومسلم)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তাঁর পথে মুক্তহস্তে খরচ করে যাও, হিসাব করতে যেয়ো না। (অর্থাৎ এ চিন্তায় পড়ো না যে, আমার কাছে কত আছে আর এখান থেকে আল্লাহর পথে কতটুকু খরচ করব) তুমি যদি এভাবে হিসাব করে আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তাহলে আল্লাহও তোমাকে হিসাব করেই দেবেন। সম্পদ আঁকড়ে ধরে ও আবদ্ধ করে রাখবে না। এমন করলে আল্লাহও তোমাদের সাথে এমন আচরণই করবেন। (অর্থাৎ রহমত ও বরকতের দরজা তোমার ওপর বন্ধ করে দেবেন) যতদূর সম্ভব মুক্তহস্ত হওয়ার চেষ্টা করো। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

নিজের দুর্বলতার ওপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত :

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। নসীহতস্বরূপ তা বলছি। একদা হারম শরীফে বসে ছিলাম। দুজন বৃদ্ধও পাশে বসা ছিল। সময়টা ছিল বাদ মাগরিব। লোকেরা তাওয়াফ করছিলেন। বৃদ্ধ দুই ব্যক্তি তাওয়াফকারীদের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করছিল। দেখ, ওই লোক পালিয়ে যাচ্ছে। ওই লোকের তাওয়াফে ভুল হচ্ছে। আমি তাদের পাশে বসা ছিলাম বিধায় বললাম, আমিও কিছু বলতে পারি? তারা বলল, হ্যাঁ বলুন। আমি বললাম, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? এসব জিজ্ঞেস করার পর বললাম, আপনার বয়স কত হয়েছে? বলল, পঞ্চান্ন। তারপর আমি বললাম নামায কখন থেকে আরম্ভ করেছেন? তারা বলল, আলহামদু লিল্লাহ ১৫ বছর বয়স থেকে পড়া আরম্ভ করেছি। যখন থেকে বালেগ হয়েছি তখন থেকে পড়ছি। মাশাআল্লাহ ঘরে দ্বীনি পরিবেশ আছে। সে কারণে শুরু থেকেই এর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। তাঁদের কথা শুনে অন্তর খুব খুশি হলো। আমি বললাম, ভাই নামাযের সুন্নাতগুলো বলেন তো। সে চারটা সুন্নাত বলে খামোশ হয়ে গেল। তার চেয়ে বয়সে বড়জনকে বললাম, আপনিও কিছু শুনিয়ে দিন। সেও চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম, চল্লিশ বছর থেকে আপনারা নামায আদায় করছেন, অথচ নামাযের সুন্নাতগুলোও মনে নেই! সুতরাং এসব তাওয়াফকারীদের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করে কী লাভ? তাওয়াফকারীদের মধ্যে তো বেশির ভাগ নতুন। সুতরাং তাদের ভুল তো হবে। আপনার কাজ হবে যারা তাওয়াফে ভুল করছে, তা মনে রাখা। তাওয়াফ শেষ হলে যাদেরকে বলা সম্ভব তাদেরকে ভুলের ব্যাপারে বলে দেওয়া। আপনারা বাইতুল্লায় বসে হারম শরীফকে সামনে নিয়ে এসব কী করছেন? এই ঘটনার পর লোকদ্বয় বড়ই লজ্জিত হলো এবং তাদের নিজের ভুলের ব্যাপারে বোধোদয় ঘটল।

আসলে আমরা অন্যের দেখাদেখি কাজ করি। নামায অন্যের দেখাদেখিই আদায় করি। সেরূপ অনেক কাজ, যেগুলো দ্বীনি কাজ সাওয়াবের আশায়ই করে থাকি। কিন্তু সবই অন্যের দেখাদেখিই করে থাকি। না আমরা আমাদের আমলকে কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখি, না জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করি। এসব আমাদের ভুল। আমাদের উচিত হলো, নিজের আমলকে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখা এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তথা আলেম-উলামা এবং মুফতী সাহেবানদের কাছে জিজ্ঞেস করে সঠিক মাসআলা জেনে নেওয়া।

এক মিনিটের মাদরাসা :

আমরা যে কাজই করি তাতে অন্যের অনুসরণ অবশ্যই থাকে। কিন্তু আমরা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকায় আমল করি তাতেই সফলতা। তাতে দুটি লাভ। প্রথমত, আমলটি সম্পাদিত হলো সর্বোন্নত পন্থায়। দ্বিতীয়ত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত পালনের সাওয়াব পাওয়া যাবে। সামান্য ফিকির এবং মনোনিবেশের প্রয়োজন। যখনই কোনো আমল সামনে আসে তখন জ্ঞাত হতে হবে এই আমলটির সুন্নাত তরীকা কী? সে মতেই আমল করা হোক। সুতরাং প্রয়োজন হলো সুন্নাতসমূহের ইলম অর্জন করা এবং এর ওপর আমল করা। তখন আমলের পাশাপাশি সুন্নাতগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে। কাজটা খুবই সহজ।

আচ্ছা বলেন তো এর জন্য কতক্ষণ সময় প্রয়োজন। উপস্থিত একজন বলে উঠলেন এক ঘণ্টা প্রয়োজন। হযরত বলেন, মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সাহসী লোক। আচ্ছা ভাই, এক ঘণ্টা নয়, শুধু এক মিনিট সময় দিন। এক মিনিট সময় দিয়েও সব সুন্নাত জানা যাবে। যেমন এক মিনিটের মাদরাসা। তার পদ্ধতি হলো, মসজিদে যেকোনো এক নামাযের পর যখন মুসল্লিও বেশি হয় প্রতিদিন পাঁচটি করে বিষয় শোনানোর নিয়ম বানানো যায়। ১. নামাযের সূরা, দু'আ এবং তাসবীহসমূহের অনুবাদ। ২. একটি সুন্নাত। তাতে প্রথমে তারতীবমত মতো নামাযের সুন্নাত শিক্ষা দেওয়া যায়। তা শেষ হওয়ার পর অন্যান্য বিষয়ে সুন্নাতের শিক্ষা দেওয়া যায়। ৩. বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে একেকটি বলা যায়। ৪. গুনাহের ক্ষতি সম্পর্কে বলা। এ ক্ষেত্রে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর জাযাউল আমাল থেকে একেকটি পড়া যায়। ৫. আমলে সালেহ তথা উত্তম কাজের ফজীলত ও উপকার সম্পর্কে একেকটি প্রতিদিন বলা যায়। এসব বিষয়ও জাযাউল আমাল কিতাবে রয়েছে।

এই পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করতে সময় লাগে না। বরং এক মিনিটেই শেষ করে ফেলা যায়।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

আসুন গুনাহমুক্ত জীবন গড়ি

ফুর্তির জায়গা :

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন খেয়েদেয়ে ফুর্তি করার জন্য নয়। বরং কষ্ট করে কিছু কামাই করার জন্য। মনে রাখবেন, দুনিয়া কামাই করার জয়গা। আর জান্নাত হলো ফুর্তি করার জায়গা। দুনিয়া কষ্টক্লেশের নাম। আর আখেরাত সুখ-শান্তির নাম।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওই সত্ত্বা, যাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব দান করেন। তিনি খন্দক যুদ্ধে নিজে কোদাল হাতে পরিখা খননে ব্যস্ত অথচ যবান মোবারকে উচ্চারিত হচ্ছিল–

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة

হে আল্লাহ! আপনি আনসার ও মুহাজির সাহাবাদেরকে ক্ষমা করুন। আর পরিখা খননে তাদের কষ্টক্লেশ দেখে শুরুতেই শান্ত্বনার বাণী শোনালেন যে, আমোদ-ফুর্তির জায়গা হলো আখেরাত, দুনিয়া নয়।

চাকরির চিন্তা :

ফুর্তির জায়গা কোনটি আর আয়-রুজির জায়গা কোনটি নির্ণয় করতে পারলে শরীয়ত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাও অতি সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

দেখুন, একজন দুষ্ট ছাত্রও কিন্তু একসময় রাত জেগে লেখাপড়া করে। কারণ পরের দিন তার পরীক্ষা। সে এ ব্যাপারে অবগত যে, এখন মেহনত করলে পরীক্ষায় পাস করব। পাস হলে চাকরি পাব। বোঝা গেল, রাতের ঘুম হারাম করার পেছনে চাকরির চিন্তাই মূল কারণ। একজন দুষ্ট ছাত্রও যদি বুঝতে পারে রাত জেগে মেহনত করলে সে কী পাবে, তাহলে আমাদের কেন আখেরাতের বুঝ আসে না। লোকেরা যদি বুঝতে পারে, মেহন করলে কিছু পাওয়া যাবে, আমাদের কেন এই বুঝ আসে না যে, মেহনত করলে আখেরাত পাব। আমাদের আয়ুর পরিধি অনেক কম। জীবন একবারই লাভ হয়, বারবার নয়। অতএব যত পারা যায় আখেরাতের জন্য মেহনত করতে হবে। কারণ আমাদের সম্পর্ক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে। মনে রাখবেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন কোনো বিশেষ অঞ্চলের জন্য নয়। বরং পুরো দুনিয়ার জন্য।

وما ارسلناك الا كافة للناس

অজুহাত নয়, সচেতন হোন :

আমাদের জযবা ও মেহনত অনুপাতেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাহায্য করবেন। দুনিয়াতে আমাদের আগমন নেক কাজ করা জন্য। সুতরাং নেক কাজ করাই স্বভাবে পরিণত করতে হবে। এই শ্রমবাজারে বিভিন্ন অজুহাতে শ্রম থেকে বিরত থাকলে পারিশ্রমিক পকেটে আসবে না। দেখুন, একজন শ্রমিক কিন্তু জ্বর, সর্দি ও কাশির অজুহাত দিয়ে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে না। কারণ তার জানা আছে, শ্রম দিলেই কিছু আসবে, নয়তো রিক্তহস্তে কালাতিপাত করতে হবে। ফলে সে কাজের ব্যাপারে সচেতন থাকে। খুঁড়া কোনো অজুহাত খুঁজে না, অবহেলাও করে না। মনে রাখবেন, অজুহাত দুনিয়ার বেলায় চলতে পারে, আখেরাতের বেলায় নয়। ইরশাদ হচ্ছে–

وان ليس للانسان الا ماسعى

যা করেছ, তাই পাবে। গন্তব্যে গেলে তাই উসুল হবে। (আন নাজম ৩৯)

পাপমুক্ত থাকা সহজ :

আমরা মনে করি, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন কাজ। অথচ এটা অনেক সহজ। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কোনো কঠিন বিধান দান করেননি। যা তার সামর্থ্যের মধ্যে, তা-ই দান করেন। ইরশাদ করেন–

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আল্লাহ সামর্থ্যের বাইরে কাউকে বাধ্য করেন না। (বাকারা ২৮৬)

চেষ্টা বান্দার :

যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় জমে যাবে তখনই গুনাহ থেকে বাঁচার পথ সুগম হবে। বান্দা হিসেবে চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে। তবেই আল্লাহ বাঁচাবেন। চেষ্টা করে দেখুন আল্লাহ এমনভাবে বাঁচাবেন, যা কল্পনাও করতে পারবেন না। গুনাহ থেকে বাঁচার সত্যিকারের ইচ্ছা থাকলে আল্লাহ উপকরণ তৈরি করে দেবেন। আল্লাহ বান্দাকে মাহরুম করতে পারেন না। তিনি তো অতিশয় দয়ালু। মেহনতের পথ ও পন্থা ভুল হলে ভিন্ন কথা।

আয় অনুপাতে ব্যয় :

অনেকে বলেন, চাকরি করি পরিবার চলে না। কিন্তু কেন? আয় অনুপাতে ব্যয় করুন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, দুনিয়া কামানোর জায়গা,

খাওয়ার জায়গা নয়। হারাম ছেড়ে হালাল অবলম্বন করুন। হারাম পোলাও-বিরিয়ানি ছেড়ে হালাল জাউ খান। হারাম কোরমা ছেড়ে হালাল ডাল খান। দেখবেন খুব চলবে। আবার শান্তিও পাবেন। এটাও না পারলে রোযা রাখেন। তবুও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, হারাম খাব না, গুনাহ আমাকে ছাড়তেই হবে। শুরুতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেও পারেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই কেটে যাবে। এমনভাবে রিযিকের দুয়ার খুলে যাবে, যা কল্পনাতীত। ইরশাদ করেন–

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য সব কিছু সহজ করে দেন।

টুকটাক সমস্যা আসতে পারে তবে পেরেশান হতে নেই। বরং আফিয়াতের দু'আ করুন। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। ইরশাদ করেন–

فان مع العسر يسرا ☆ ان مع العسر يسرا

"নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয়, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

দুনিয়াতে সর্বাধিক পরীক্ষার সম্মূখীন হল নবীগণ এরপর যারা তাঁদের যত বেশি অনুসরণকারী। (মুসনাদে বাযযার- হা. ১১৫০)

দুনিয়া সমস্যার জায়গা :

গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে কিছু ঝড়ঝাপটা ও সমস্যা আসতে পারে। তবুও হিম্মত হারানো যাবে না। কারণ সমস্যাপূর্ণ জায়গার নামই হলো দুনিয়া।

শেষ কথা হলো, অন্তর ও স্বভাব অপবিত্র হলে গুনাহের সুযোগ ও স্থান তালাশ করে। আর পবিত্র হলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অতএব, আসুন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যতই ক্ষতি বা কষ্ট হোক না কেন, অবশ্যই গুনাহ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এবং আপনাদেরকে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন

খানেকাহে এমদাদিয়া
আশরাফিয়া আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
২৫,২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ইং
২ ,৩ রবিউল আওয়াল ১৪৩৬ হি.
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

Shop # 10, Green Super Market (Ground Floor) Green Road Dhaka 1205, Bangladesh
Tel : 0088-02-9135987 Fax : 0088-02-8121538 Mobile : 0088-01675 209494, 01819 270797
E-mail: taosif07@gmail.com

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 09
80/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039,
Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

Monalisa Tiles

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta Road
Hatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424,
Mobile: 01675303592, 01711527232

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

সত্যসন্ধানী লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতি ভেবে দেখার আহ্বান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

(১৬ জানুয়ারি ২০১৩ ঈ. মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় 'লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক প্রদত্ত বয়ান সামান্য পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে পেশ করা হলো।)

নেহায়াত কাবেলে ইহতেরাম উলামায়ে কেরাম, মেহমানানে ইযাম ও আযীয তলাবা! প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি প্রত্যেক ফেতনার যামানায় ফেতনা প্রতিরোধের জন্য আহলে হকের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে গাইরে মুকাল্লিদদের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে, অথচ বাস্তবে তারা মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারী। তারা বিভিন্ন স্থানে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, (কিন্তু কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তাতে তারা উপস্থিত হয় না, বরং ফেতনা সৃষ্টি করে) এমনকি কোনো কোনো স্থানে আহলে হক তথা আহলুস সুন্নাহওয়াল জামাআতের সাথে মারামারি করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে এই বিষয়ে সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশের এবং বাতিল প্রতিরোধের ইজতেমা হওয়া সময়ের দাবি ছিল।

এই ধরনের ইজতেমা প্রত্যেক এলাকায় বেশি বেশি হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের ইজতেমার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় আমি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে সময়ের দাবি মোতাবেক এই ধরনের ইজতেমার আয়োজন করায় ফকীহুল মিল্লাত, দেশ ও দ্বীনের মুরব্বি হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা.বা.)-এরও শুকরিয়া আদায় করছি। হযরতের দীর্ঘ হায়াতে তাইয়্যেবাহর জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা হযরতের ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন

আমি আহলে হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। মূল আলোচনার আগে সংক্ষেপে এই ফেরকার পরিচয় সম্পর্কে কিছু কথা বলব।

ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ দখল করার পর যখন বুঝতে পারল যে, মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা বেশ মুশকিল। সত্যিকার মুসলিম জনতা কখনো কারো কাছে মাথা নত করে না, তখন তারা মুসলমানদেরকে বাগে আনার জন্য বিভিন্ন ফন্দি আঁটল। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, 'মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত করে দিতে হবে। 'বিভক্ত করো আর শাসন করো'–এই নীতির আওতায় মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করার জন্য ইংরেজ সরকার তাদের অনুগত চারজন লোকের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে চার ধরনের ফেতনা ছড়িয়ে দিল।

১. মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, তিনি নবুওয়াত দাবি করলেন। তার অনুসারীরা তার কথা মেনে কাফের-বেঈমান হয়ে গেল। ফলে তারা ইংরেজদের গোলামে পরিণত হলো।

২. মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী, তিনি সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার চটকদার বুলি আউড়িয়ে সরলমনা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করলেন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মুকাল্লিদদেরকে অর্থাৎ মাযহাব মাননেওয়ালাদেরকে কাফের-মুশরিক বলে ফতওয়া দিলেন, ইংরেজদের শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে আখ্যা দিলেন, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে হারাম বলে ফতওয়া দিলেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ইংরেজদের গুণকীর্তন করলেন। মানুষকে গোমরাহ করলেন। ২৫ বছরের মাথায় তিনি নিজ পত্রিকা 'এশায়াতুস সুন্নাহতে (১১খ. ২ সংখ্যা ৫৩ পৃ.) বললেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যেতে চায় তার জন্য সহজ পথ হলো, তাকলীদ ছেড়ে দেওয়া।' আল্লাহ তা'আলার আজীব কুদরত। যে এই ফেতনা প্রচার করল, তার মুখ থেকেই আল্লাহ তা'আলা এই ফেতনার আসল চেহারা প্রকাশ করে দিলেন।

বর্তমান আহলে হাদীস জামাআত শুরুর দিকে নিজেদেরকে 'মুহাম্মদী' 'সালাফী' 'লা-মাযহাবী' 'ওয়াহাবী' 'আসারী' ইত্যাদি বলে পরিচয় দিত। কিন্তু এসব পরিচয়ে তারা সুবিধা

করতে পারছিল না।

তাই তখনকার আহলে হাদীসগুরু মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন জানালেন, 'আমার সম্পাদিত 'এশায়াতুস সুন্নাহ' পত্রিকায় ১৮৮৬ ঈ. সনে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওয়াহাবী শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমক হারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। (উল্লেখ্য, তখন ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ও তার অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী বলা হতো। মুহাম্মাদ হুসাঈন বাটালবীর এই চিঠি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহলে হাদীস দলটা মূলত ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দল। (এই স্বাধীনতাবিরোধী দলকে প্রতিরোধ করা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী প্রত্যেক সরকারের দায়িত্ব।) সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ওই অংশের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন হবে না, যাদেরকে 'আহলে হাদীস' বলা হয় এবং যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমক হালালী, আনুগত্য ও কল্যাণই কামনা করে, যা বারবার প্রমাণিতও হয়েছে এবং সরকারি চিঠিপত্রে এর স্বীকৃতিও আছে।

অতএব এ দলের প্রতি ওয়াহাবী শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং সাথে সাথে গভর্নমেন্ট বরাবর অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আবেদন করা যাচ্ছে যে, সরকারি ভাবে এই ওয়াহাবী শব্দ রহিত করে আমাদের ওপর এই শব্দ প্রয়োগের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক এবং এই শব্দের পরিবর্তে 'আহলে হাদীস' বলে আমাদেরকে সম্বোধন করা হোক।'

আপনার অনুগত খাদেম

আবূ সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন

সম্পাদক, এশায়াতুস সুন্নাহ

তার এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর দফতরের পক্ষ থেকে 'তার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো এবং তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম সরকারি ভাবে বরাদ্দ করা হলো' এই মর্মে তার নিকট চিঠি পাঠানো হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠি নং নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট সেক্রেটারি মি. ডাব্লিউ এম এন চিঠি নং ১৭৫৮-এর মাধ্যমে, সি পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৪০৭-এর মাধ্যমে, ইউ পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৩৮৬-এর মাধ্যমে, বোম্বাই গভর্নমেন্ট চিঠি নং ৭৩২-এর মাধ্যমে, মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট চিঠি নং ১২৭-এর মাধ্যমে, বাঙ্গাল গভর্নমেন্ট চিঠি নং ১৫৫-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীকে তাদের জন্য আহলে হাদীস নাম বরাদ্দের খবর জানায়। (সূত্র : এশায়াতুস সুন্নাহ, পৃ. ৩২-৩৯, সংখ্যা ২, খণ্ড ১১)

৩. আহমদ রেজা খান, তিনি কবর পূজা, মাজার পূজা, মীলাদ, কিয়াম এ-জাতীয় সব বিদ'আতের প্রচার-প্রসার করলেন। দেওবন্দী উলামায়ে কেরামকে কাফের ফতওয়া দিলেন। তার অনুসারীরা তার নামের সাথে নিসবত করে নিজেদেরকে 'রেজভী' বলে। তার বাড়ি ভারতের বেরেলী নামক স্থানে। তাই ভারত ও পাকিস্তানে এই ফেরকাকে 'বেরেলী' বলা হয়।

৪. আবুল আ'লা মওদূদী, তিনি কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আম্বিয়া (আ.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ভুল ধরার দায়িত্ব নিলেন। ভুল আকীদা প্রচার করে তিনি মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে শুরু করলেন। ইংরেজরা জানত যে, মুসলমান যতক্ষণ পাক্কা মুসলমান থাকবে, ততক্ষণ তারা তাদের গোলামী করবে না। মুসলমান কেবল গোমরাহ হলেই তাদের গোলামী করবে। তাই মওদূদী সাহেবের মাধ্যমে আম্বিয়া (আ.) ও সাহাবা (রাযি.)-এর সম্পর্কে ভুল আকীদা প্রচার করে সূক্ষ্মভাবে তারা মুসলমানদেরকে গোমরাহ করতে লাগল। মওদূদী সাহেব যে ইংরেজদের তাবেদার ছিলেন, তা তার কার্যক্রম দ্বারাই বুঝে আসে। ওই যমানায় আমাদের মুরব্বি শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন করছিলেন। আর মওদূদী সাহেব তখন হুসাইন আহমাদ মাদানীর বিরুদ্ধে লিখছিলেন। একজন ইংরেজবিরোধী আন্দোলন করছে, আর আরেকজন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে লিখছে এর দ্বারা কী বুঝে আসে?

এই চারজনই খুব নিষ্ঠার সাথে ইংরেজদের সেবা করে গেছেন। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। তারা মারা গেছেন, কিন্তু তাদের বই-পুস্তক ও মতবাদ আজও রয়ে গেছে। তাদের বই-পুস্তকের মাধ্যমে এখনো হাজারো লোক গোমরাহ হচ্ছে। আজকের এই মজলিসে আমরা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালবীর গড়া তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করব। ইনশা আল্লাহ।

(বি.দ্র. যদিও ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদীস মতবাদের গোড়াপত্তন করেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী মৃত : ১২৭৫ হিজরী, কিন্তু তার সময়ে এই মতবাদ প্রচার লাভ করেনি। মূলত

মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর দ্বারাই ভারত উপমহাদেশে এই মতবাদ ছড়ায়। সে হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে তাকেই এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।)

আমার আলোচনা কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১. আমাদের দেওবন্দী আকাবিরদের প্রতিরোধের মুখে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও আহলে হাদীস নামক ফেতনার দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাদের অলসতার সুযোগে তারা আবার নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এত দিন পর্যন্ত তারা গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। এখন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা বলে, আমরা নাকি আবূ হানীফা (রহ.)-এর ইত্তিবা করে কাফের হয়ে গেছি (?) আমরা কোথায় ইমাম আবু হানীফার ইত্তিবা করলাম? আমরা তো অনেক মাসআলায় আবূ হানীফা (রহ.)-এর তাকলীদই করি না। কারণ সেই মাসআলাগুলো স্পষ্ট। আবার হাজারো মাসআলায় হানাফী মুফতীগণ সাহেবাইনের (ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.) মতানুযায়ী ফাতাওয়া দেন। তাহলে কিভাবে আমরা আবূ হানীফা (রহ.)-এর সরাসরি ইত্তিবা করলাম? আর সব বিষয়ে কি ইমামের তাকলীদ করা হয়? তাকলীদ তো করা হয় এমন কিছু জটিল বিষয়ে, যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে একই বিষয়ে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক একাধিক হুকুম পাওয়া যায়, এখন কোনটা নাসেখ আর কোনটা মানসূখ তা তো আমরা জানি না বা বুঝতে পারি না। এরূপ ক্ষেত্রে খাইরুল কুরূনের মুজতাহিদ ইমামদের বুঝকে আমরা আমাদের বুঝের চেয়ে শতগুণ উত্তম মনে করে তাদের বুঝের অনুসরণ করি, তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার অনুসরণ করি না। এটাই তাকলীদের মূলকথা। কিন্তু যেসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্টভাবে আছে যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানে রোযা রাখা, যাকাত দেওয়া, হজ্ব করা এ-জাতীয় শত শত বিষয়ে আমরা কোনো ইমামেরই তাকলীদ করি না। কারণ এসব বিষয় কুরআন-সুন্নাহ থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তাহলে আমরা ইমামদের তাকলীদ করে কিভাবে কাফের-মুশরিক হয়ে গেলাম?!

লা-মাযহাবী-আহলে হাদীস নামক এই ভ্রান্ত মতবাদকে নতুন করে চাঙ্গা করে গেছেন মরহুম নাছিরুদ্দীন আলবানী। তার কোনো উস্তাদ ছিল না। কেউ তার কোনো উস্তাদ দেখাতে পারবে না। (নাছিরুদ্দীন আলবানীর বাড়ি সিরিয়ায়। পূর্বে ছিল ইউরোপের আলবানিয়া নামক স্থানে। তার পিতা নূহ নাজাতী হানাফী মাযহাবের শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কিত আচরণে অধৈর্য হয়ে তিনি ছেলেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। আর সিরিয়ার জনগণ শাইখ আলবানীকে বিতর্কিত মতবাদের কারণে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়। তারপর তিনি সৌদি আরবে আশ্রয় নেন। একপর্যায়ে সৌদি উলামায়ে কেরাম এবং জনগণও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে সরকারি নির্দেশে ১৯৯১ সালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি আরবভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর জর্ডানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই ১৯৯৯ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাসিক আল আবরার, বসুন্ধরা, জানুয়ারি ২০১৩ ঈ.।) নিজে নিজে রিসার্চ করে যা বুঝেছেন তাই লিখেছেন। তার বিশেষ অবদান(?) এই যে, তিনি হাদীসের কিতাব থেকে সহীহ আর যয়ীফকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পরে যয়ীফের সাথে মউযূকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আর কিতাবের নাম রেখেছেন, سلسلة الاحاديث الضعيفة و الموضوعة واثرها السيء فى الامة 'সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাহ ওয়াল মাউযূআহ ওয়া আসারুহাস সাইয়িউ ফিল উম্মাহ। প্রশ্ন এই যে, যয়ীফ আর মাউযূকে কি একই হুকুম দেওয়া যায়? মাউযূ তো হাদীসই না, এটা তো রাসূল (সা.)-এর নামে মিথ্যা কথা। অথচ যয়ীফ তো হাদীস। যু'ফ মূলত সনদের সিফাত, হাদীসের সিফাত নয়। যেমনিভাবে সহীহ, হাসান এগুলোও সনদের সিফাত, হাদীসের সিফাত নয়। এর দ্বারা সনদের অবস্থা বোঝানো হয়। যয়ীফ হাদীস যদি উম্মত কবুল করে নেয় তাহলে তা সহীহর মতো হয়ে যায় যেমন : لاوصية لوارث এই হাদীসের সনদ তো যয়ীফ কিন্তু উম্মত এই হাদীস ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে আসছে বলে এই হাদীস মা'মূলবিহী হয়েছে এবং এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ হুকুমও সাবেত হয়েছে। এমনিভাবে যয়ীফ হাদীস যদি একাধিক সনদে আসে তাহলে তা হাসান লিগাইরিহী হয়ে যায়। তখন এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ হুকুমও সাবেত হয়। যেমন : طلب العلم فريضة على كل مسلم এই হাদীসটি ৫০টি সনদে এসেছে। (ইবনে মাজাহ ২২৪ নং হাদীসের টিকা) প্রত্যেকটি সনদই যয়ীফ। কিন্তু এতগুলো সনদে আসায় হাদীসটি হাসান লিগাইরিহী হয়ে গেছে, ফলে এর দ্বারা ফরযের মতো গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সাবেত করা হয়েছে। আর যয়ীফ হাদীস যদি হাসান লিগাইরিহী পর্যন্ত নাও পৌঁছে তবুও তাকে অহেতুক বলা যাবে না;

বরং কিছু শর্তসাপেক্ষে ফযীলাতের ক্ষেত্রে আমলযোগ্য। তাহলে এবার আপনারাই বলুন, যয়ীফ হাদীসকে মউযূ হাদীসের মতো মনে করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বর্তমানে আরব বিশ্বে আলবানীর বিরুদ্ধে অনেক কিতাব লেখা হচ্ছে। 'তানাকুযাতে আলবানী' নামক কিতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কিতাবে আলবানীর স্ববিরোধী কথা-কাজ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো এক জায়গায় কোনো একটি হাদীস তার মতের পক্ষে হওয়ায় তিনি ওই
হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন আবার ওই একই সনদের হাদীস দ্বারা যখন তার বিরোধীরা দলিল দিয়েছেন তখন তিনি হাদীসটিকে যয়ীফ বলে দিয়েছেন। এ-জাতীয় অনেক ঘটনা ওই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (শাইখ আলবানীর বিরুদ্ধে লিখিত আরো কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো : শাইখ আবদুল্লাহ সিদ্দীক আলগুমারী প্রণীত القول المقنع فى الرد على الالبانى المبتدع 'নতুন মতবাদের প্রবর্তক আলবানীর সন্তোষজনক প্রতিউত্তর'। শাইখ মাহমূদ সাঈদ মাহমূদ প্রণীত ছয় ভলিউমে প্রকাশিত বিশাল কিতাব التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف 'যে ব্যক্তি হাদীসকে সহীহ ও যয়ীফ দুই ভাগে ভাগ করেছে তার ভুলভ্রান্তির পরিচয়'। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (রহ.) প্রণীত كلمات فى كشف اباطيل و افتراءات 'আলবানীর বাতিল মতবাদ ও মিথ্যা অপবাদের উন্মোচনে কিছু কথা'। এ
ছাড়া আরো অনেক কিতাব রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।) যাহোক বলা হচ্ছিল যে, আহলে হাদীস ফেরকাটাকে ব্রিটিশরা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে তৈরি ও অনুমোদন করে গেছে।

২. ১২৪৬ হিজরীর আগে পৃথিবীতে আহলে হাদীস নামে কোনো ফেরকা ছিল না। 'আহলুল হাদীস' তো মুহাদ্দিসীন তথা হাদীস বিশারদ ইমামদের উপাধি। বর্তমান আহলে হাদীস ফেরকা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে এ কথার দাবি করছে যে, তারা সর্বক্ষেত্রে হাদীস মেনে চলে। অথচ হাদীসের কিতাবে কোথাও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীস মানতে বলেননি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেখানেই নিজেকে মানতে ও অনুসরণ করতে বলেছেন, সেখানেই সুন্নাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মাতকে সুন্নাহর অনুসরণ করতে বলেছেন, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, হাদীস অনুসরণ করতে কিংবা আঁকড়ে ধরতে বলেননি; বরং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোমরাহ ফেরকার কার্যক্রম বোঝাতে গিয়ে হাদীস শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ গোমরাহ ফেরকা মানুষকে হাদীস বলে বলে গোমরাহ করবে, সুন্নাহ বলে নয়। যেমন নবীজি (সা.) এক হাদীসে বলেন, 'শেষ যামানায় অনেক প্রতারক ও মিথ্যুক লোকের আবির্ভাব হবে, তারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস পেশ করবে, যা তোমরাও শোননি, তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শোনেনি। সাবধান! তারা যেন তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।' (সহীহ মুসলিম হা. নং ৭)
আর জেনে রাখা উচিত যে, হাদীস ও সুন্নাহ এক নয়; বরং এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের আকাবিরগণ, বিশেষ করে বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন ও শাইখুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. তার বিভিন্ন কিতাবে হাদীস ও সুন্নাহর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা এই যে, উম্মতের জন্য দ্বীনের ওপর চলার অনুসরণীয় পথকে সুন্নাহ বলে। আর প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস, কিন্তু অনেক হাদীস সুন্নাহ হলেও সকল হাদীস সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ সকল হাদীস উম্মতের জন্য দ্বীনের ওপর চলার অনুসরণীয় পথ নয়। কেননা হাদীসের মধ্যে এমন অনেক হাদীস আছে, যা মানসূখ তথা রহিত হয়ে গেছে, যেমন : বুখারী শরীফের কিতাবুল জানায়েযের প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী ১৩০৭-১৩১৩ নং হাদীসগুলো মানসূখ। এই হাদীসগুলোতে জানাযা নিয়ে যেতে দেখলে সকলকে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। এই হুকুম অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। (উমদাতুল কারী ৬/১৪৬) এমনিভাবে প্রথম যুগে নামাযে কথা বলা, সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া সবই জায়েয ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী হা.নং ১১৯৯, ১২০০) এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে এই হুকুম ছিল যে, আগুনে পাকানো কোনো জিনিস খেলে উযু
ভেঙে যাবে, কিন্তু পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৮) সেরূপ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরতের পর মদীনায় ১৬/১৭ মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এই হুকুম রহিত হয়ে গেছে। (সহীহ বুখারী হা. নং ৭২৫২) এগুলো সবই সহীহ হাদীস, কিন্তু সুন্নাহ নয়। অর্থাৎ এই

হাদীসগুলো উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। আর এমন অনেক হাদীস আছে, যার হুকুম নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথেই সীমাবদ্ধ যেমন: নবীজি (সা.)-এর একসাথে চারের অধিক স্ত্রীকে বিবাহ করা এবং মহর ছাড়া বিবাহ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সহীহ হাদীসে এসেছে। অতএব এগুলো হাদীস বটে, কিন্তু উম্মতের জন্য অনুসরণীয় নয়। (সুবুলুল হুদা ওয়াররশাদ ফী সীরাতে খাইরিল ইবাদ ১১/১৪৩-২১৭)

এমন অনেক হাদীস আছে, যা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কোনো বিশেষ প্রয়োজনে করেছেন যেমন : কোমরে ব্যথা থাকায় বা বসলে কাপড়ে নাপাক লাগার আশংকায় তিনি সারা জীবনে মাত্র দুবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, অতএব এই সহীহ হাদীসের কারণে কি দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলা যাবে? তেমনি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় এবং রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯৩৮) তাই বলে কি ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানোকে সুন্নাহ বলা যাবে?

অনেক সময় বিষয়টি শুধু জায়েয এ কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক কাজ করেছেন। যেমন : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার তাঁর এক নাতনিকে (উমামাহ বিনতে যয়নাব) কোলে নিয়ে নামায পড়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫১৬) এই ঘটনা তো সহীহ হাদীসে এসেছে, তাই বলে কি বাচ্চা কোলে নিয়ে নামায পড়ানোকে সুন্নাহ বলা যাবে? কখনো না; বরং এই হাদীস দ্বারা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাচ্চাকে কোলে নিয়েও নামায পড়া বা পড়ানো যেতে পারে। এমনিভাবে রোযা অবস্থায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এক বিবিকে চুম্বন করেছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ১৯২৮) তাই বলে কি রোযা রেখে স্ত্রী চুম্বন করাকে সুন্নাহ বলা যাবে?

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল যে, আহলে হাদীস নামটাই ঠিক না। কারণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে কোথাও হাদীস মানতে বলেননি; বরং সুন্নাহ মানতে বলেছেন। যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে, তাদের উচিত ১১টি বিবাহ করা, মহর ছাড়া বিবাহ করা, ইহরাম ও রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, রোযা অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করা এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করা ইত্যাদিকে সুন্নাহ মনে করা। তারাবীহ নামায শুধু তিন দিন মসজিদে এসে পড়া, কারণ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু তিন দিনই মসজিদে এসে তারাবীহ পড়েছেন। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০১২) নামাযে কথা বলা ও সালাম দেওয়ার কথাও যেহেতু সহীহ হাদীসে এসেছে, তাই তাদের উচিত, নামাযে কথা বলা ও সালাম দেওয়া। কিন্তু তারা তো এসব করে না। তাহলে কিভাবে তারা আহলে হাদীস হলো? বোঝা গেল, তাদের নামটাই সঠিক না এবং তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বললেও বাস্তবে তারা সব হাদীস মানে না।

তাছাড়া নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি। তাই আমরা নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলি অর্থাৎ আমরা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ মানি এবং সাহাবায়ে কেরামের জামাআতকে অনুসরণ করি। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন ও মানতে বলেছেন এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো :

☆ المتمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر شهيد (المعجم الاوسط برقم٥٤١٤)

☆ تركت فيكم امرين ...كتاب الله وسنة رسوله(المؤطا لمالك برقم ٨٩٩)

☆ من احيا سنة من سنتى قد اميتت بعدى فان له من الاجرمثل اجورمن عمل بها ....(ترمذى برقم ٢٦٧٧)

☆ من احيا سنتى فقد احبنى ومن احبنى كان معى فى الجنة (ترمذى برقم٢٦٧٨)

☆ من اكل طيبا وعمل فى سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنة .ترمذى برقم٢٥٢٠)

☆ تمسك بسنة خير من احداث بدعة ...مسند احمد٤/١٠٥)

☆ ما من نبى بعثه الله فى امته قبلى الا كان له فى امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته...(الصحيح لمسلم برقم٨٠)

☆ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها...(ابوداود برقم٤٦٠٧)

☆ستة لعنتهم و لعنهم الله ...و التارك لسنتى .(ترمذى برقم٢١٥٤)

☆ فعليكم بماعرفتم من سنتى و سنة الخلفاء الراشدين ...(ابن ماجة برقم٤٣)

দশটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, যার সব কটিতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে বলেছেন এবং সুন্নাহ ত্যাগকারীর ওপর লানত করেছেন। একটি হাদীসেও তিনি শুধু হাদীসকে (অর্থাৎ এমন হাদীস, যা সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছেনি) আঁকড়ে ধরতে বলেননি। আহলে হাদীস দাবিদার ভাইয়েরা কি এমন একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস পেশ করতে পারবেন, যার মধ্যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতকে হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেছেন কিংবা হাদীস অনুযায়ী উম্মতকে চলতে বলেছেন? হ্যাঁ নবীজি (সা.) হাদীসকে রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, অন্যের কাছে পৌঁছাতে বলেছেন, কিন্তু হাদীস আঁকড়ে ধরতে বলেননি বা হাদীস অনুযায়ী আমল করতে বলেননি। আমল করার জন্য হাদীস অবশ্যই সুন্নাহ পর্যায়ে পৌঁছতে হবে।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য করে গেছেন অর্থাৎ সুন্নাহর ওপর আমল করতে বলেছেন আর হাদীসকে শুধু রেওয়ায়েত করতে বলেছেন, তাই এই পার্থক্য ঠিক রাখার জন্য হাদীসের সংকলকগণ তাদের কিতাবের নাম হাদীস শব্দ দ্বারা রাখেননি; বরং সুন্নাহ শব্দের বহুবচন 'সুনান' দ্বারা রেখেছেন। যেমন : সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন্ নাসাঈ, সুনানু ইবনে মাজাহ, সুনানুত তিরমিযী, সুনানুদ দারেমী, সুনানুদ্দারাকুতনী, সুনানুল বাইহাকী, সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর ইত্যাদি। এসব কিতাবের লেখকগণ নিজ নিজ কিতাবে 'বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবে ওয়াস্সুন্নাহ' নামক শিরোনাম দিয়ে কুরআন এবং সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী উল্লেখ করেছেন। শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রেও তারা হাদীস শব্দ ব্যবহার করেননি। এমনিভাবে আইম্মায়ে উসূল শরীয়তের দলিল চতুষ্টয় বর্ণনার সময় প্রথমে কিতাবুল্লাহ এরপর সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ বলেছেন। এখানেও তারা হাদীস শব্দ ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ হাদীসু রাসূলিল্লাহ বলেননি। কারণ তারা বুঝতেন যে, হাদীস সাধারণভাবে উম্মতের আমল করার জন্য নয়; বরং সুন্নাহ অনুযায়ী উম্মতকে চলতে হবে, আমল করতে হবে।

৩. আহলে হাদীস ফেরকা তাকলীদকে শিরক বলে। অথচ তারা তাদের দাবি প্রমাণে বুখারী, মুসলিম এই ধরনের যেসব হাদীসের কিতাব দেখে দলিল দেয়, সেসব কিতাবের কোথাও তাকলীদকে শিরক বলা হয়নি; বরং এই কিতাবগুলোর লেখক সবাই কোনো না কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করতেন। যেমন : ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এই চারজন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ ১/৪২৫) আর ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ এই দুজন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। (মাআরেফুস সুনান)১/৮২-৮৩)

এখন প্রশ্ন এই যে, তাকলীদ করার করণে কেউ যদি মুশরিক হয়ে যায় তাহলে তাদের কথা অনুযায়ী সিহাহ সিত্তার ছয়জন লেখকই মুশরিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের কিতাব দিয়ে দলিল দেয় কেন? মুশরিকদের লেখা কিতাব দিয়ে দলিল দেওয়া জায়িয হবে কি? (তাছাড়া মুজতাহিদ ব্যতীত আজ পর্যন্ত যেসব বড় বড় উলামায়ে কেরাম পৃথিবীর বুকে আগমন করেছেন তারা সবাই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহর সুগভীর জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও তাকলীদ করাকেই নিজের জন্য নিরাপদ মনে করেছেন। আজকাল কিছু কিছু লোককে দেখা যায়, তারা অনুবাদের সাহায্যে দু-চারটা হাদীস মুখস্থ করে নিজেকে পূর্বযুগের আলেমদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করে। তারা কয়েকটি হাদীসের বাংলা অনুবাদ পড়েই নিজেকে যুগের মুজতাহিদ ভাবতে শুরু করে। এমনটা করা কখনোই তাদের জন্য শোভনীয় নয়। যারা বিজ্ঞ আলেম কিংবা ফকীহ নয় তাদের কাজ তো শুধু এতটুকু যে, তারা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, উলামা এবং ফুকাহায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী আমল করবে। উস্তাদ ছাড়া নিজে নিজেই কুরআন বা হাদীস রিসার্চ করা সাধারণদের দায়িত্ব নয়। আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মানুষকে এ দায়িত্ব দেননি। সাধারণদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন 'তোমরা কোনো কিছু না জেনে থাকলে আহলুযযিকির তথা উলামা-ফুকাহার কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও' সূরা নাহল : ৪৩, সংকলক)

৪. আহলে হাদীস ফেরকা যে হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, যয়ীফ, ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করে এসবও তো তারা তাকলীদ করণেওয়ালাদের কিতাব থেকেই নিয়েছে। উসূলে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'নুখবাতুল ফিকার' এবং 'মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ' যথাক্রমে

শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ইবনে হাজার আসকলানী ও ইবনুস সলাহ (রহ.) লিখেছেন। 'মুকদ্দামাতুশ শাইখ' হানাফী মাযহাবের অনুসারী আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রহ.) লিখেছেন। ('আততাসবিয়াতু বাইনা হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা' প্রসিদ্ধ হানাফী মুহাদ্দিস ও ফকীহ, ইমাম তহাবী (রহ.) লিখেছেন। 'তাওজীহুন নযর' তাহের ইবনে সালেহ জাযায়েরী হানাফী লিখেছেন। 'তাউযীহুল আফকার' আমীরে সনআনী হানাফী লিখেছেন। 'শরহু শরহি নুখবাতিল ফিকার' মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখেছেন। 'কফবুল আসার ফী সফবি উলূমিল আসার' রযিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম হানাফী লিখেছেন। 'ইমআনুন নযর' শায়খ আকরাম সিন্দী হানাফী লিখেছেন। 'আররফউ ওয়াততাকমীল' আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী লিখেছেন। 'আততাকয়ীদ ওয়াল ঈযাহ' যাইনুদ্দীন ইরাকী হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন। 'আল ইলমা' কাযী ইয়ায মালেকী (রহ.) লিখেছেন।) এমনিভাবে উসূলে হাদীসের ওপর আরো যত কিতাব আছে সবই কোনো না কোনো মুকাল্লিদ তথা মাযহাবের অনুসারী লিখেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের মতানুযায়ী এই সব মুশরিকদের কিতাব থেকে নেওয়া সহীহ, যয়ীফ এ-জাতীয় অন্যান্য পরিভাষা ব্যবহার করা তাদের জন্য কিভাবে বৈধ হবে?

৫. আহলে হাদীস সম্প্রদায় তথা যারা মাযহাব মানে না, তাদের কোনো ধারাবাহিক সিলসিলা (তথা ধারাপরম্পরা) নেই। তারা নতুন উদ্ভাবিত দল। আর আমরা যারা মাযহাব মানি তাদের ধারাবাহিকতা আছে। ১৪শ বছর যাবত এই পৃথিবীতে মাযহাব মাননেওয়ালাদের কিতাব পড়া ও পড়ানো হচ্ছে। আহলে হাদীস সম্প্রদায় নতুন উদ্ভাবিত হওয়ার দলিল হলো তাদের জন্মই হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের গর্ভে। ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ দখল করার আগে যদি তাদের কোনো অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তারা ১২৪৬ হিজরীর আগে আহলে হাদীস সম্প্রদায় কর্তৃক লেখা হাদীস, উসূলে হাদীস, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, ফিকহ, উসূলে ফিকহ সম্পর্কীয় কোনো কিতাব দেখাক। আহলে হাদীস দাবিদার ভাইদের পক্ষে সম্ভব হলে উপরোক্ত ছয় বিষয়ে লিখিত ছয়টি কিতাব দেখাক। তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ সম্পর্কে লিখিত যেসব কিতাব পৃথিবীর বুকে আছে, তা সবই কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী কিংবা মুজতাহিদ লিখেছেন। তারা মাযহাব মাননেওয়ালাদের কিতাব পড়ে আবার তাদেরকেই মুশরিক বলে কী আজব বৈপরীত্য!

মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী, যিনি দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন তিনি বলেন, হযরত মাওলান ইবরাহীম বালইয়াবী (রহ.) বলেন, আমার একজন আহলে হাদীস উস্তাদ ছিলেন। তিনি ফাতাওয়াও লিখতেন। আমি একদিন তার কামরায় প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, তিনি (হানাফী মাযহাবের ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাব) হেদায়া এবং ফাতাওয়া আলমগীরিইয়াহ অধ্যয়ন করছেন। তখন আমি বললাম, হযরত আপনি আহলে হাদীস হওয়া সত্ত্বেও হানাফীদের কিতাব অধ্যায়ন করছেন কেন? তিনি বললেন, এই সব কিতাব ছাড়া জুযইয়্যাত (খুঁটিনাটি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান) আর কোথায় পাব? এই সব কিতাব দেখেই ফাতাওয়া দিই, কিন্তু দলিলের আলোচনায় এই সব কিতাবের নাম উল্লেখ করি না; বরং হেদায়ার মতো ও টিকায় দলিল হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেসব হাদীস উল্লেখ করে দিই। আর লিখে দিই, এই মাসআলা অমুক হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে। (মালফূযাতে ফকীহুল উম্মত ২/৯১) আল্লামা ইবরাহীম বালইয়াবী সাহেবের উস্তাদ উক্ত আহলে হাদীস আলেম স্পষ্ট স্বীকার করলেন যে, তারাও মূলত হানাফীদের কিতাবের প্রতি মুখাপেক্ষী। আর তারা হানাফীদের কিতাবের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেই না বা কেন, তাদের তো কোনো কিতাব নেই। মুকাল্লিদদের লিখিত কিতাব ছাড়া তারা এক কদমও এগোতে পারে না।

৬. আহলে হাদীস সম্প্রদায় যদিও বলে, আমরা কারো তাকলীদ করি না, কিন্তু তারা বাস্তবে মুহাদ্দিসীনে কেরামের তাকলীদ করে থাকে। কারণ, তারা কোনো বিষয়ের দলিল হিসেবে বুখারী, মুসলিম ও প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের হাদীসের কিতাব থেকে হাদীস পেশ করে থাকে। যার অর্থই হলো তারা তাদের তাকলীদ করে। অথচ বড় বড় মুহাদ্দিসীন নিজেরা ফাতাওয়া না দিয়ে ফাতাওয়ার জন্য ফুকাহা কেরামের কাছে যাওয়ার জন্য বলতেন। এর কারণ হিসেবে ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি তার সুনানে কিতাবুল জানায়েযের একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, هكذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث 'ফকীহগণ এই হাদীসের ব্যাপারে এমনটিই বলেছেন, আর তারা হাদীসের অর্থ সবচেয়ে

ভালো জানেন।' (তিরমিযী হা. নং ৯৯০)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম যে ফাতাওয়ার জন্য মুজতাহিদ ইমামদের কাছে যাওয়ার জন্য বলতেন এ রকম দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

প্রথম ঘটনা : সুলাইমান ইবনে মেহরান আল আ'মাশ (রহ.)-এর কাছে এক লোক ফাতাওয়া নিতে এলে তিনি প্রশ্নকারীকে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। (ইমাম আবূ ইউসুফ সুলাইমান ইবনে মেহরানের ছাত্র ছিলেন। তিনি তার কাছে হাদীস পড়েছেন।) তো আবূ ইউসুফ (রহ.) প্রশ্নকারীর উত্তর দিয়ে দিলেন। তখন আ'মাশ (রহ.) আবূ ইউসুফ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই উত্তর কিভাবে দিলে? তখন তিনি বললেন, গতকাল আপনি যে হাদীস পড়িয়েছেন তার মধ্যেই তো এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তখন তিনি বললেন, انتم الاطباء ونحن الصيادلة 'আসলে তোমরা ডাক্তার আর আমরা ওষুধ বিক্রেতা' অর্থাৎ ওষুধ বিক্রেতার কাছে যেমন অনেক ওষুধ থাকে, কিন্তু কোন ওষুধ কোন রোগের জন্য, তা তার জানা থাকে না। ঠিক তেমনিভাবে এমন মুহাদ্দিস যে মুজতাহিদ না তার কাছে অনেক হাদীস থাকে, কিন্তু কোন হাদীস দ্বারা কোন মাসআলা প্রমাণিত হয়, তা তার জানা থাকে না। (আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, লিসসয়মারী পৃ. ১২-১৩, আসারুল হাদীস...পৃ. ১২৩)

দ্বিতীয় ঘটনা : সদরুদ্দীন (রহ.) মানাকেবে আবূ হানীফা নামক কিতাবে লিখেছেন, একবার ইয়াযীদ ইবনে হারুন (যিনি অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসদের উস্তাদ ছিলেন)-এর কাছে একজন ফাতাওয়া চাইতে এল। তখন তার কাছে তার ছাত্রদের মধ্যে থেকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, যুহাইর ইবনে হারব প্রমুখ মুহাদ্দিসীন উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি মুস্তাফতীকে বললেন, তুমি ফাতাওয়ার জন্য এখানে এসেছ কেন? আহলে ইলমদের কাছে যাও। তখন আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বললেন, হুজুর আপনার নিকট উপস্থিত এই বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ কি আহলে ইলম নয়! তিনি বললেন, না, তোমরা আহলে ইলম নও; বরং তোমরা হলে আহলুল হাদীস (তথা হাদীস বিশারদ) আর আহলে ইলম হল আবূ হানীফার ছাত্ররা' (ইরশাদুল কারী পৃ. ৩২)

এই দুই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ফাতাওয়ার জন্য ফুকাহা তথা মুজতাহিদগণের কাছে যাওয়ার জন্য বলতেন। এখন তথাকথিত আহলে হাদীসদের কাছে প্রশ্ন হলো, তারা যেসব মুহাদ্দিস ইমামদের তাকলীদ করে সেই মুহাদ্দিস ইমামগণ ফাতাওয়ার জন্য যাদের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন তারা তাদেরকে মানে না কেন? এ ক্ষেত্রে তারা তাদের ইমামদের অনুসরণ করে না কেন? তারা কি এই প্রশ্নের কোনো গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারবে? তাদের ইমামদের মান্যবর মুজতাহিদকে কি তারা মুশরিক বলতে পারবে?

৭. তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের দলিল মানে না। অথচ ইজমা ও কিয়াসের দলিল হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইজমার দলিল হওয়া সূরা নিসার, ১১৫ নং আয়াত

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم (سورة النساء ١١٥)

দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, এই আয়াতে মুফাসসিরীন এবং উসূলিইয়ীন উলামায়ে কেরাম শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজমার দলিল হওয়া প্রমাণ করেছেন। আর সূরা হাশরের ২ নং আয়াত

فاعتبروا يا اولى الالباب .سورة الحشر٢

দ্বারা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিয়াসের দলিল হওয়া প্রমাণিত হয়। তাছাড়া হাদীসের কিতাবে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের কিয়াসের ভুড়িভুড়ি প্রমাণ রয়েছে। (কেউ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে মাসিক আল আবরারে প্রকাশিত 'সিরাতে মুস্তাকীম' শিরোনামে হযরতের ধারাবাহিক লেখা পড়ে নিতে পারেন, যা সেপ্টেম্বর ২০১২ ঈ. থেকে শুরু হয়েছে)

আহলে হাদীস সম্প্রদায় ইজমা-কিয়াসকে শরীয়তের দলিল না মানায় তারা

اليوم اكملت لكم دينكم ...سورة المائدة٣

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম' মায়েদা : ৩ এই আয়াতকে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। কেননা এমন হাজার হাজার মাসআলা আছে, যার সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ফকীহগণ ইজমা অথবা কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে থাকেন। যারা ইজমা এবং কিয়াসকে শরীয়তের দলিল মানবে না তারা ওই সব মাসআলার সমাধান কিভাবে দেবে? আর আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

'আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এর বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব হবে? এখানে এমন কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো আমাদের জানা মতে, যার সমাধান সরাসরি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে এই সমস্ত মাসআলার সমাধান কোনো প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া স্পষ্ট কুরআনের আয়াত কিংবা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেওয়ার অনুরোধ করা হলো।

১. ডেসটিনি ২০০০লি. জায়েয হবে কি না?

২. প্রাইজ বন্ড কেনা জায়েয হবে কি না?

৩. প্রভিডেন্ড ফান্ড বা জিপি ফান্ডের টাকা ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

৪. বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?

৫. প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয হবে কি না?

৬. বীমা-ইনস্যুরেন্স করা জায়েয হবে কি না?

৭. ট্রেডমার্ক বেচাকেনা জায়েয হবে কি না?

৮. দেশি-বিদেশি কাগজের নোট পরস্পরে কমবেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না?

৯. অ্যাডভান্সের টাকা গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

১০. শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করা বা দান করা জায়েয হবে কি না?

১১. বিমানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

১২. রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া জায়েয কি না?

এখানে হাজার হাজার আধুনিক মাসায়েলের মধ্য থেকে মাত্র বারোটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো। তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় সক্ষম হয়ে থাকলে, কোনো প্রকার কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্তত এই বারোটি মাসআলার সমাধান যেন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেয়। কুরআনের স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা এই মাসআলাগুলোর সমাধান না দিতে পারলে তারা তাদের মতানুযায়ী 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' এই আয়াত অস্বীকারকারী প্রমাণিত হবে। যার ফলে তারা বেঈমান প্রমাণিত হবে।

৮. কোনো মাসআলা তাদেরকে বললে তারা বলে, আপনি 'সহীহ সরীহ মুত্তাসিল মারফূ হাদীস' দিয়ে দলিল দিলে আমরা মানতে রাজি আছি। আমি তাদেরকে বলব, আপনারা 'সহীহ সরীহ মুত্তাসিল মারফু হাদীস' কাকে বলে তথা এই হাদীসের সংজ্ঞা যদি কুরআনের আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমরা প্রত্যেক মাসআলা 'সহীহ সরীহ মুত্তাসিল মারফূ হাদীস' দ্বারা প্রমাণ করতে পারব। তাদের পক্ষে সম্ভব হলে, তারা যেন কুরআন কিংবা হাদীস দ্বারা 'সহীহ সরীহ মুত্তাসিল মারফূ হাদীস'-এর সংজ্ঞা প্রমাণ করে দেখায়, অথবা শুধু এতটুকু প্রমাণ করে দেখায় যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু 'সহীহ সরীহ মুত্তাসিল মারফূ হাদীস'ই মানতে বলেছেন, অন্য কোনো হাদীস মানতে নিষেধ করেছেন।

৯. আহলে হাদীস তথা যারা কোনো ইমাম মানে না, বরং সর্বক্ষেত্রে হাদীস মানার দাবি করে, তাদের কাছে সবিনয় আরয এই যে, আপনাদের মতে তো মুকতাদীর সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া মুকতাদীর নামায হয় না অর্থাৎ মুকতাদীকে ইমামের পেছনেও সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। তাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন এই, আপনাদের কেউ যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয়, যখন ইমাম সাহেব কিরাআত শেষ করে রুকুতে চলে গেছেন, তখন আপনারা তাকে কী করতে বলবেন? অর্থাৎ তার সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে আপনারা কী বলবেন? যদি বলেন, সে রুকূতে সূরা ফাতেহা পড়ে নেবে তাহলে আমরা বলব, নবীজি (সা.) রুকু-সেজদার মধ্যে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। আর সূরা ফাতেহা কুরআনের অংশ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত। অতএব রুকূতে সূরা ফাতেহা পড়া যাবে না। (তিরমিযী হা. নং ২৬৪, তিরমিযী (রহ.) এই হাদীসকে 'হাসানুন সহীহুন' বলেছেন।) আর যদি বলেন, সে এই রাকাআতে ইমামের সাথে শরীক হবে না এবং তাকবীরে তাহরীমাহও বাঁধবে না, বরং পরবর্তী রাকাআত থেকে ইমামের ইকতেদা করবে। তাহলে আমরা বলব, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় ইমামের ইকতেদা করতে বলেছেন। (তিরমিযী হা. নং ৫৯১, আলবানী সাহেবও এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন) অতএব দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। আর যদি বলেন, সে ইমামের সাথে শরীক হবে, কিন্তু এই রাকাআত গণনা করবে না। তাহলে আমরা বলব, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূ পেলে রাকাআত গণনা করতে বলেছেন। (আবূ দাউদ হা. নং ৮৯৩, আলবানীর তাহকীক,

তিনিও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন) অতএব রুকূ পেলে রাকাআত না ধরার কোনো উপায় নেই। আর যদি বলেন, সে সূরা ফাতেহা না পড়ে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইমামের ইকতেদা করবে। তাহলে আমরা বলব, আপনাদের মতানুযায়ী তো সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া মুকতাদীর নামাযই হয় না। সুতরাং এই উত্তরেরও সুযোগ আপনাদের নেই।

১০. এমনিভাবে আপনাদের কেউ যদি এমন সময় মসজিদে আসে, যখন ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহার শেষাংশ ولاالضالين পড়ছেন তখন আপনারা তাকে কী করতে বলবেন? আপনারা যেহেতু মুক্তাদির জন্য ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা পড়া জরুরি বলেন, তাই এ বিষয়টি মাথায় রেখে সঠিক উত্তর দেবেন। যদি বলেন, ইমামের সাথে সেও আমীন বলবে, কারণ হাদীসে এসেছে 'ইমাম যখন ولاالضالين বলে তখন তোমরা আমীন বল' (বুখারী হা. নং ৭৮২) তাহলে আমরা বলব, আপনাদের মতে তো তার জন্য সূরা ফাতেহা পড়া জরুরি, সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া তার নামাযই হবে না। তাহলে সূরা ফাতেহা না পড়েই কিভাবে সে আমীন বলবে? আর যদি বলেন, সে ইমামের ولاالضالين শোনা সত্ত্বেও আমীন বলবে না, বরং নিজে নিজে ফাতেহা পড়া শেষ করে আমীন বলবে। তাহলে আমরা বলব 'ইমাম যখন ولاالضالين বলে তখন তোমরা আমীন বলো' এই হাদীসের ওপর কিভাবে আমল হবে?

আপনারা কোনো হাদীসের বিরোধিতা না করে এই প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারলে আমরা খুবই বাধিত হব। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর যদি আপনাদের কাছে না থাকে, তাহলে আমরা আপনাদেরকে এই মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করার আহ্বান জানাচ্ছি। কেননা হানাফী মাযহাব অনুসারে উক্ত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো হাদীসেরই বিরোধিতা করতে হবে না। তার বিবরণ এই যে, সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া নামায না হওয়ার হাদীসটি ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, মুকতাদী এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। তার সূরা ফাতেহা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে ইমামের ولاالضالين পড়া অবস্থায় যে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে ইমামের সাথে শরীক হবে, তার জন্য আমীন বলতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ তার জন্য সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান নেই। অতএব সে ইমামের ولاالضالين শুনে আমীন বলতে পারবে। আর এতে তার কোনো হাদীসের বিরোধিতাও করতে হবে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর সদা সর্বদা অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংকলন ও গ্রন্থনায় : জালীস মাহমূদ

পবিত্র রামাযানুল মোবারক উপলক্ষে
ইমাম, উলামা ও মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য

২৫ দিন ব্যাপী
আন্তর্জাতিক মানের
ক্বেরাত প্রশিক্ষণ
২০১৪

২৫ শা'বান থেকে
২০ রামাযান ১৪৩৫ হিজরী পর্যন্ত

স্থান
হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. প্রতিষ্ঠিত
জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া
আশ্‌রাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা-১২১১।

ক্বেরাতের দারস্ দেবেন:
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (হারদুঈ রহ.) এর বিশিষ্ট খলিফা, শতাধিক কিতাবের লেখক
আল্লামা ক্বারী আবুল হাসান আ'জমী
দেওবন্দ, ভারত

সহযোগিতায় থাকবেন :
মাওলানা ক্বারী সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী
মাওলানা ক্বারী ছিদ্দিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

ভর্তি ফি : ১৫০০ টাকা। জামিয়ার পক্ষ থেকে ফ্রি খানার ব্যবস্থা থাকবে।
থাকার বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্নদের সনদ দেয়া হবে

আরজগুযার : শাহ্ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মুহতামিম
সার্বিক সহযোগিতায় : মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী নায়েবে মুহতামিম
যোগাযোগ : ০১৭১২০৫২১৮৫, ০১৭১২৬৩৮২২০, ০১৭১২০৩২২৭৩

বি:দ্র: ১৫ শা'বান হতে ২৫ রামাযান পর্যন্ত নূরিয়া তালীমুল কোরআন বোর্ডের উদ্যোগে মুআ'ল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭৫২-৬৬৭৮২৩

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-৪

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ইল্লতের সংজ্ঞা ও ইল্লত এবং হেকমতের মধ্যে পার্থক্য :

অভিধানে علت শব্দটির আইন (ع)বর্ণে যের এর সাথে হলে অসুস্থতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায় ইল্লতের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার সারমর্ম হলো–

ইল্লত ওই বস্তুকে বলা হয়, যা নস (কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট আহকাম) থেকে নিসৃত হুকুমের জন্য নিদর্শন হয়। এবং তা নসের মধ্যেই উল্লেখ থাকে। যখন এই নিদর্শন নসের বহির্ভূত বস্তুর শাখা-প্রশাখায় পাওয়া যায় তখন তার ভিত্তিতে নসের বহির্ভূত বস্তুও এ হুকুমের আওতাধীন এসে যায়। কিন্তু সমস্ত সংজ্ঞার যে সারমর্ম বের হয় তা হলো এই, নসবহির্ভূত বস্তুতে ইল্লত পাওয়া গেলে তখন ইল্লতটা হুকুমের মূল ভিত্তি হয়।

সুতরাং যদি ইল্লত পাওয়া যায়, তাহলে হুকুমও পাওয়া যাবে, আর যদি ইল্লত পাওয়া না যায়, তাহলে হুকুমও পাওয়া যাবে না।

হেকমত :

হেকমত (حـكـمـت) এর আভিধানিক অর্থ অটল ও দৃঢ়তা।

পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ :

হেকমত ওই স্বার্থকে বলা হয়, যার জন্য কোনো হুকুম অনুমোদিত হয়েছে, চাই তা উপকার অর্জনের জন্য হোক বা ক্ষতি দূর করার জন্য হোক। (হিকমাতুত তাশরীইল ইসলামী ফি তাহরিমির রিবা পৃ. ৩০)

ইল্লত ও হেকমতের মাঝে পার্থক্য :

ইল্লত ও হেকমতের সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ইল্লত হলো হুকুমের মূল ভিত্তি, হেকমত হলো ওই হুকুম থেকে অর্জিত উপকার।

উদাহরণস্বরূপ : মুসাফিরের জন্য নামায কসর করার হুকুম রয়েছে। ওই হুকুম প্রণয়নে হেকমত ও মাসলাহাত বা এর থেকে অর্জিত ফায়দা হলো কষ্টক্লেশ থেকে রক্ষা পাওয়া।

এখানে কসরের মূল ভিত্তি হলো সফর। তাই কষ্টক্লেশ থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় কসর করতে হবে। অন্য দিকে কষ্টদায়ক সফর সফরে শরয়ী না হলে সেখানে কসর করা যাবে না। যেহেতু হুকুমের মূল ভিত্তি সফর। কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি নয়।

হেকমত ও ইল্লতের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য সাধারণ জাগতিক আইনের এই উদাহরণও পেশ করা যায়, ট্রাফিক আইন আছে যে, যখন লালবাতি জ্বলে তখন গাড়ি থামাতে হবে। এটি হুকুম। এর ইল্লত হলো লালবাতি জ্বলে ওঠা। হেকমত হলো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া। তাই লালবাতি জ্বলে উঠলে দুর্ঘটনা ঘটার দূরতম সম্ভাবনা না থাকলেও গাড়ি থামাতে হবে। কেননা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এই হুকুমের ভিত্তি নয়। ভিত্তি হলো লালবাতি জ্বলে ওঠা।

এ পর্যায়ে ইল্লত ও হেকমতের পরিচিতি ও পার্থক্য নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা হয়েছে দুটি কারণে। প্রথমত, একটি অবান্তর যুক্তির খণ্ডন। দ্বিতীয়ত, সামনে সুদের হুকুমের ইল্লত সম্পর্কে যে আলোচনা আসছে, তা সহজবোদ্ধ হওয়া।

একটি অবান্তর যুক্তি ও এর খণ্ডন :

তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবীরা এ মর্মে যুক্তি দিয়ে থাকে যে, ইসলামী শরীয়তে সুদের নিষিদ্ধতা জুলুমের কারণে করা হয়েছে। তা-ই বর্তমান ব্যাংকঋণ, যা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়, সেখানে সুদ নিলে তা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে না বরং তা ইনসাফ ও ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় ব্যবসায়িক ঋণের ওপর নেওয়া সুদ অবৈধ নয়। তাদের এই অবান্তর ও বিকৃত যুক্তির মূলই হলো ইল্লত ও হেকমতের মধ্যে পার্থক্যকরণে ব্যর্থ হওয়া। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ইল্লত কি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। তবে এখানে স্পষ্ট করতে হয় জুলুম কোনোভাবেই সুদের হুকুমের ইল্লত নয়। এর মৌলিক দলিল হলো, সুদ যখন নিষিদ্ধ হয়, তখনও আরব সমাজে ব্যবসয়িক ঋণের প্রচলন ছিল। তাদের দাবি মতে এতে জুলুম ছিল না। ইসলামী শরীয়ত তখন এটিকেও নিষিদ্ধ করেছে। এতে বোঝা যায়, সুদ নিষিদ্ধের ইল্লত জুলুম নয় বরং অন্য কিছু। জুলুম সুদের বহু খারাবির একটি মাত্র। যার থেকে রক্ষা পাওয়া সুদের হুকুমের হেকমত বৈ কিছু নয়।

মুদ্রার মধ্যে রিবার ইল্লতের অনুসন্ধান :

মুদ্রাতে সুদের উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। রিবাল ফজল ও রিবান নাসিয়াহ। উভয়টির ইল্লত পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

মুদ্রার মধ্যে রিবাল ফজলের ইল্লত সম্পর্কে তিনটি মত প্রসিদ্ধ।

১. হানাফী মাযহাব মতে রিবাল ফজলের ইল্লত পরিমাপ ও সমজাতীয় বস্তু হওয়া (قدر مع الجنس) এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতও। (আদ দুররুল মুখতার মা'আ রাদ্দিল মুহতার ৭/৩০৫) অর্থাৎ মুদ্রাতে এ দুটো বিষয় পাওয়া গেলে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় দিক সমান সমান হতে হবে। কোনো একদিকে অতিরিক্ত দেওয়া-নেওয়া রিবাল ফজল

হওয়ার কারণে হারাম হবে। যেমন স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় দিক সমপরিমাণে হতে হবে। কোনো একদিকে অতিরিক্ত প্রদান সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। একই বিধান রুপার ক্ষেত্রেও। কেননা দুটি বস্তুই পরিমাপযোগ্য ও সমজাতীয়।

উপর্যুক্ত মতের সপক্ষে দলিল :

☆ قال الله تعالى اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ☆ وزنوا بالقسطاس المستقيم۔

মাপকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না আর সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করো। (সূরা শু'আরা আয়াত ১৮১-১৮২)

☆ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النا س اشياء هم

আর হে আমার জাতি! ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ করো ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনো রূপ ক্ষতি করো না। (সূরা হুদ, আয়াত ৮৫)

☆ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اووزنوهم يخسرون

যারা মাপে কম করে তাদের জন্য দুর্ভোগ, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। (সূরা আল মুতাফফিফীন ১-৩)

এই পবিত্র আয়াতসমূহে মাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে, এবং তাতে কম দেওয়া থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যার দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, সুদের ইল্লত হলো পরিমাপযোগ্য ও সমজাতীয় হওয়া। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/১৮৪)

ওই হাদীসসমূহ সম্পর্ক উল্লেখিত ছয় বস্তুর সাথে। এর বেশ কিছু উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো কিছু হাদীস নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো এই ইল্লতের ভিত্তি।

☆ الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا۔

স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে মেপে মেপে সমান সমান করে বিক্রি কর। রুপাকে রুপার বিনিময়ে মেপে মেপে সমান সমান করে বিক্রি করো। অতএব যে বৃদ্ধি করল বা অতিরিক্ত চাইল তা সুদ হবে। (মুসলিম)

☆ لا تبيعوا الذهب بالذهب الاوزنا بوزن

স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া বিক্রি করো না। (প্রাগুক্ত)

☆ لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين

এক দেরহামকে দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না এক ছা'কে দুই ছা'র বিনিময়ে (মাপের প্রকার) বিক্রি করো না।

এই হাদীসে দেরহামের সম্পর্ক ওজনের সাথে এবং ছা' এর সম্পর্ক পরিমাপের সাথে। আর ছা' শরয়ী পরিমাপকে বলা হয়। তবে এখানে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই বস্তু, যা ওই পরিমাপ দ্বারা মাপা হয় এবং একই প্রকারের বস্তুকে একই প্রকারের বস্তুর সাথে লেনদেনও করা হয়। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রিবার ইল্লত হলো পরিমাপযোগ্য ও সমজাতীয় বস্তু হওয়া, একই অবস্থা ছয় বস্তু বিশিষ্ট হাদীসসমূহের ক্ষেত্রেও। কেননা তার মধ্যেও একই প্রকারের পণ্যের লেনদেন একই প্রকারের সাথে। এবং প্রত্যেকটি বস্তুই ওজনি বা পরিমাপযোগ্য ।

ماوزن مثلا بمثل اذا كان نوعا واحدا وماكيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به۔

যে বস্তু ওজন করা যায়, তখন তা সমান সমান হওয়া চাই, যদি একই প্রকারের হয়। এবং যে বস্তু পরিমাপ করা হয় তারও এই হুকুম, তবে যখন উভয়টা ভিন্ন জাতীয় হবে তখন (কমবেশি হলে) কোনো সমস্যা নেই। (নাইলুল আওতার)

১. মালের বিনিময়ে মাল প্রদান করার নাম বাই বা ব্যবসা, আর তার চাহিদা হলো উভয় দিকে সমতা হওয়া অর্থাৎ উভয় দিকে যে মাল হবে যেন কোনো মালে কিছু অংশও বিনিময়হীন না থাকে। এবং এক দিনার অন্য দিনারের সাথে যেমনিভাবে আকৃতির দিক দিয়ে সমান তেমনিভাবে মানের দিক দিয়েও সমান। আকৃতিতে সমান হওয়ার অর্থ হলো এই যে, উভয়টি ওজনি বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর মান এজন্য সমান যে, উভয়টি একই জাতের। এখন যদি কোনো একদিকে এক দিনার বা আদা দিনার অতিরিক্ত হয় তাহলে তা বিনিময়হীন হবে, আর এটাই হলো প্রকৃত সুদ ও সুদের বাস্তবতা। সুতরাং এই আকৃতিগত বা মানগত মিল যে বিনিময়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে, সেখানে কোনো এক দিকে অতিরিক্ত দেওয়া বা নেওয়া বৈধ হবে না। অতএব প্রতীয়মান হলো যে, রিবাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের ইল্লত হলো পরিমাণ, পরিমাপ ও সমজাতীয় বস্তু হওয়া। (বাদায়ে সানায়ে ৫/১৮৪)

২. মুদ্রার মধ্যে রিবাল ফজল বা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের ইল্লতের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত হলো সমজাত হওয়া ও প্রকৃতিগত মূল্যমান (خلقى ثمنيت) যাকে পদার্থগত মূল্যমান (ثمن جوهرى) বা প্রাধান্য বিস্তারকারী মূল্যমানও বলা হয়। ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতও এটি। (রাওজাতু তালেবীন ৩/৩৭৮)

এই মত অনুসারে যেহেতু মুদ্রার প্রাকৃতিক ও পদার্থগত মূল্যমান রিবাল ফজল তথা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের ইল্লত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তাই তাদের নিকট এই ইল্লত প্রাকৃতিক মূল্যমানের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর তাহলো

শুধু স্বর্ণ-রুপা ও এর সাথে সম্পর্কিত বস্তুসমূহ। অতএব শুধু স্বর্ণ ও রুপার পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে রিবাল ফজল হারাম হবে, পয়সা ইত্যাদিতে নয়। তাঁরা এর সমর্থনে দলিল হিসেবে এটিও পেশ করে থাকেন যে, স্বর্ণ, রুপার দ্বারা সর্বপ্রকার বস্তুতে সলম বৈধ। এমনকি ওজনি বস্তুর মধ্যেও বৈধ। অথচ সলমের অর্থই হচ্ছে বাকিতে ক্রয়। রিবাল ফজলের ইল্লাত যদি পরিমাপ বা ওজন হয় তাহলে বাকিতে ক্রয় বৈধ হওয়ার কথা নয়। এতে স্পষ্ট হয় মুদ্রার মধ্যে রিবাল ফজলের ইল্লত পরিমাপ নয় বরং মূল্যমান হওয়া। (মাজমুউল ফাতাওয়া ২৯/৪৭১)

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার খণ্ডন :

স্বর্ণ ও রুপার মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত (কারণ) প্রাধান্য বিস্তারকারী মূল্যমানকে নির্ধারণ করা অসম্পূর্ণ ইল্লত। অর্থাৎ তখন এটা স্বর্ণ-রুপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্য বস্তুর দিকে সম্প্রসারিত হবে না। অথচ মানসুস তথা রায় দেওয়া হয়েছে এ রকম বস্তুর মধ্যে ইল্লতের কোনো কার্যকারিতা নেই। কেননা মানসুসের মধ্যে হুকুম নসের ওপর নির্ভরশীল হয়, ইল্লতের ওপর নয়। আর যদি শাখা-প্রশাখার দিকে উক্ত ইল্লত প্রসারিত না হয় তাহলে ওই ইল্লত দ্বারা ফায়দাই বা কী?

৩। মুদ্রার মধ্যে সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত জাত ও সাধারণ মূল্যমান। এটা মালেকী মাযহাব। (আল মুদাওয়ানাহ লিল ইমাম মালেক (রহ.) এবং হানফীদের মধ্য হতে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতও এটি। এই মতানুসারে রিবাল ফজল তথা বিনিময়সংক্রান্ত সুদের ইল্লত যেহেতু সাধারণ মূল্যমান, তাই পয়সা যদি প্রচলিত হয়ে যায় অথবা অন্য কোনো বস্তু মুদ্রা কিংবা মূল্য হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে রিবাল ফজল প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই তাদের নিকট এক পয়সাকে দুই পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা না জায়েয, আর এটি সুদি লেনদেন বলে বিবেচিত। (আহকামুল আওরাকিন নাকদিয়্যা পৃ. ১৮)

তাঁদের দলিল হলো পয়সা যখন কার্যক্ষমতার দিক থেকে দেরহাম দিনারের মতো হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে তখন সুদের বিধানেও পয়সার হুকুম দেরহাম দিনারের মতোই হওয়া উচিত। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/১৮৫)

রিবান নাসিয়াহ তথা বিলম্বজনিত সুদের ইল্লত :

মুদ্রাতে রিবান নাসিয়াহ তথা বিলম্বজনিত সুদ হারাম হওয়ার ইল্লত একেবারেই সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কেননা ঋণের যে লেনদেনে কোনো শর্তযুক্ত বা প্রথাগত বিনিময়হীন অতিরিক্ততা পাওয়া যাবে তখন ওই লেনদেন নাজায়েয হবে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই ইল্লত রিবাল ফজল (বিনিময়সংক্রান্ত সুদ)-এরও। কিন্তু সে ক্ষেত্রে যেহেতু অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলোতে রিবাকে শুধু ছয় বস্তুতে উল্লেখ করা হয়েছে তাই এর দ্বারা সন্দেহের অবকাশ থাকে যে, উক্ত বিধান শুধু ওই ছয় বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি অন্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে?

ওলামায়ে কেরামের একদল মনে করেন রিবাল ফজল শুধু ওই ছয় বস্তুতে সীমাবদ্ধ। এই প্রকারের সুদের ব্যাপারেই হযরত উমর (রা.) বলেছেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আমাদের জন্য (এই বিশেষ প্রকারের) সুদের বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেননি। তাই উক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে উলামায়ে উম্মত চিন্তা ফিকির করে নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী ওই হুকুমের ইল্লত বের করেছেন এবং তার ওপর হুকুমের ভিত্তি রেখেছেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু রিবান নাসিয়াহর মধ্যে বিশেষ কোনো বস্তুর উল্লেখ নেই বরং বলা হয়েছে كل قرض جر نفعا فهو ربا এই বক্তব্যের মাধ্যমে হুজুর (সা.) একটি ব্যাপক নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। 'ঋণের মধ্যে যেকোনো ধরনের মুনাফা অর্জন সুদ হবে।' তাই এর থেকে বেঁচে থাকা ও এটিকে পরিহার করা অপরিহার্য।

রিবার আলোচনায় আমরা দুটি শব্দই অধিক শুনে থাকি :

১. রিবান নাসা ২. রিবান নাসিয়াহ

উভয়ে মধ্যে পার্থক্য হলো, রিবান নাসার সম্পর্ক বিক্রয় (Sale)-এর সাথে। আর রিবান নাসিয়ার সম্পর্ক ঋণ (Loan)-এর সাথে।

যেমন :

১. স্বর্ণের লেনদেন স্বর্ণের সাথে হলে।
২. রুপার লেনদেন রুপার সাথে হলে।
৩. স্বর্ণের লেনদেন রুপার সাথে হলে।
৪. রুপার লেনদেন স্বর্ণের সাথে হলে।

প্রথম দুই পদ্ধতিতে দুই ধরনের সুদ পাওয়া যেতে পারে। এক. রিবাল ফজল যেকোনো একদিকে অতিরিক্ত হলে। দুই. রিবান নাসা যেকোনো এক বিনিময়ের ওপর নগদ গ্রহণ হলে আর অন্যটা বাকি থাকলে তখন এই বাকিকে রিবান নাসা বলা হয় এবং শেষ দুই প্রকারে এক পক্ষের তুলনায় অপর পক্ষের অতিরিক্ত নেওয়া বা দেওয়া বৈধ, তবে বাকি জায়েয নেই। বাকি হলে তা হবে রিবান নাসা। আর রিবান নাসিয়াহর সম্পর্ক ঋণের চুক্তির সাথে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মাধ্যমে
তাবলীগি কাজের সূচনা-২

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তাবলীগি মেহনতের প্রাথমিক নকশা

এ সম্পর্কে মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) তৃতীয়বার হজ থেকে ফিরে আসার পরে মেওয়াতের সকল থানার নকশা এবং গুড়গাঁও জেলার মানচিত্র তৈরি করালেন। দিক এবং রেখা অংকন করালেন। মুবাল্লিগদেরকে কারগুযারী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি গ্রামের জনবসতি, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামের দূরত্ব এবং প্রতিটি গ্রামের প্রধানের নাম লেখার নিয়মজারি করলেন আর এভাবে তাবলীগের কাজকে একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এলেন। এতে করে লোকদের মধ্যে তাবলীগের কাজ করার একটা জযবা পয়দা হয়ে গেল এবং অল্পদিনের মধ্যে এলাকার পরিবেশই পরিবর্তন হয়ে গেল।

সে দৃশ্য তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন : আমরা গুড়গাঁওয়ের জামে মসজিদে প্রবেশ করে যে দৃশ্য দেখলাম তা জীবনে ভোলার নয়। সেই স্বাদ এখনো অন্তরে অনুভূত হয়। আমাদের সামনে ত্রিশজনের একটি জামাত গোল হয়ে বসেছিল। যাদের মধ্যে সব বয়সেরই লোক ছিল। তের এবং ষোল বছরের দুটি ছেলেও ছিল। যুবকও ছিল আর ষাট বছরের বৃদ্ধও ছিল। প্রত্যেকের শরীরে একেকটি চাদর, একেকটি জামা, সুতির কম্বল এবং মাথায় পাগড়ি ছিল। তারা নিজেদের গ্রাম থেকে বেরিয়েছে আজ আট দিন। যার যতটুকু সামর্থ্য হয়েছে নিজের সাথে খানাপিনার সামগ্রী নিয়ে এসেছে আর পরিবারের লোকদের জন্য কিছু রেখে এসেছে। ত্রিশজনের এই জামাআত তিন দলে ভাগ হয়ে শহরের বিভিন্ন দিকে রওনা হয়ে গেল। প্রত্যেক দশজনের জামাআতে একজন করে আমীর এবং একজন করে মুআল্লিম নির্ধারিত ছিল। একজন সাথি এসব মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, ভায়েরা আমার! আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করুন যে, তিনি আমাদেরকে এই বরকতময় কাজে বের হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। তাবলীগের রাস্তা আম্বিয়ায়ে কেরামের রাস্তা। আল্লাহর রহমতের দরজা আপনাদের জন্য খুলে গেছে। সাধারণ তাবলীগের সুন্নত মুর্দা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, আপনাদের হাতে সেটা যিন্দা হচ্ছে।

আল্লামা নদভী (রহ.) বলেন, এসব জামাআতের বাইরে বের হওয়ার অনেক বড় ফায়েদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৩৫৬ হিজরীতে হযরত মাওলানা যখন চতুর্থবার হজের জন্য গমন করেন তখন দাওয়াত ও তাবলীগের এই নেজাম ইসলামের মারকায মক্কা-মদীনায় প্রচার করেন এবং সেখান থেকে ফেরার পর মেওয়াতে তার তৎপরতা বৃদ্ধি করেন।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আলেম উলামা এবং মাদ্রাসার যিম্মাদার ব্যক্তিবর্গকে এদিকে আকর্ষণ করলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকেরা তেমন একটা গুরুত্ব দিল না। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই যখন তারা এর লাভ ও উপকার প্রত্যক্ষ করল তখন এদিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করল। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) নিজেও মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরের শিক্ষকদেরকে নিয়ে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করলেন।

দিল্লিতে বসবাসকারী মুসলমান ব্যবসায়ীরা বিশেষ উৎসাহের সাথে এতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। এমনকি দূর-দূরান্তের এলাকা যথা খোরজা, আলীগড়, আগ্রা, বুলন্দশহর, মীরাঠ, মুরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং করাচি পর্যন্ত জামাআত যেতে লাগল। শুধু মেওয়াতেই নয় বরং পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অত্যন্ত সূচারুরূপে এই কাজ আঞ্জাম পেতে লাগল।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর একীন

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর আল্লাহ তা'আলার ওপর একীন ছিল পরিপূর্ণ, যা একজন মুসলমানের অন্যতম গুণ হওয়া দরকার। যারা হযরত মাওলানাকে দেখেছেন তারা এ কথা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাওলানা মঞ্জুর নুমানী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি যদিও অত্যন্ত দুর্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ ছিলেন কিন্তু এই মহা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন যে, আমার মনে হয় যদি কারো সামনে জান্নাতকে তার সমস্ত নেয়ামতসহ উপস্থিত করা হয় আর জাহান্নামকে তার সমস্ত বিভীষিকা আর আযাবসহ উপস্থিত করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, তুমি যদি এই সমস্ত কাজ করো তাহলে তোমাকে জান্নাত দেয়া হবে আর এগুলো না করলে জাহান্নামে ফেলা হবে। তাহলে সে ব্যক্তি যত মেহনত মুজাহাদা করবে তার পরিমাণ হযরত মাওলানার মেহনতের তুলনায় অল্পই হবে। বিশেষ করে মাওলানার শেষ জীবনের মেহনত ছিল অকল্পনীয়। (বিশ বড়ে মুসলমান-৫৯৩)

তাবলীগের অভ্যন্তরীণ শক্তি

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তাবলীগের এই কাজের মাধ্যমে মানুষদেরকে কী এমন জিনিস

দিয়েছিলেন, যার কারণে এত বড় পরিবর্তন সাধিত হলো? সেটি ছিল আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যের একীন। মাওলানা এই বাস্তবতাকে অত্যন্ত মজবুতভাবে মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, এই জগতের একজন মালিক আছেন। তার নিকটই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। জগতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বস্তুও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে পারে না। যা কিছু হবে তারই ইচ্ছায় সংঘটিত হবে।

এই বিষয়টি বোঝার জন্য একটি ঘটনা নিয়ে চিন্তা করুন। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে এমন এক মেওয়াতীর নিকট জনৈক ব্যক্তি জানতে চাইল তার তাবলীগি জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা। মেওয়াতী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলতে শুরু করল, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একবার তিন ব্যক্তির একটি জামাআত মুরাদাবাদ পাঠালেন। তার মধ্যে একজন আমিও ছিলাম। জামাআত রওনা করার সময় হযরত মাওলানা হেদায়াত দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহর নামে রওনা হয়ে যাও, বিশেষ কোনো বিপদে পড়লে নির্জনে দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট তার সমাধানের জন্য দু'আ করবে।

আমরা একটি এলাকায় গিয়ে সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করলাম। মাগরিবের পর এলান হলো "সকলে বসে যাবেন, কিছু দ্বীনের কথা আলোচনা হবে"। কিন্তু সুন্নাত শেষ করে দেখলাম মসজিদে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা পরের দিনও সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মাগরিবের পরে যথারীতি এলান করলাম। কিন্তু সেদিনও একই অবস্থা দেখা গেল। লোকেরা মসজিদ থেকে একে একে বের হয়ে গেল। এবার হযরত মাওলানার নসীহতের কথা মনে পড়ল। রাতটা কাটিয়ে আমরা সকালে লোকালয়ের বাইরে চলে গেলাম এবং সেখানে সারা দিন দু'আ করতে থাকলাম। সন্ধ্যার সময় এসে সেই মসজিদে আবার মাগরিবের নামায আদায় করলাম এবং বিগত দুই দিনের মতো আজও যথারীতি এলান হলো।

এতটুকু বলে মেওয়াতী থেমে গেল। তারপরে একটু দম নিয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কথা কী বলব, একটি লোকও সেদিন উঠল না। কেমন যেন কেউ তাদেরকে আটকে রেখেছে। বস্তুত কাজ তো এভাবেই হয়।

যারা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারা কত মূল্যবান জিনিস হাসিল করেছে। হযরত মাওলানা তাদের সামনে কত বড় রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন!! তাদেরকে এমন ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছেন, যার মালিক হওয়ার জন্য ভগ্ন হৃদয় আর প্রবাহমান অশ্রু ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এটা এমন এক শক্তি, যা পাহাড়কে নাড়া দিতে পারে। যমীনকে দুলিয়ে দিতে পারে। নিরস্ত্রকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দিতে পারে। নিরক্ষরকে বড় বড় স্কলারের সাথে মোকাবেলা করার সাহস জোগাতে পারে। এটা এমনই এক রহমতের ঝর্ণাধারা, যা লাভ করে মূর্খ বাকশক্তি লাভ করে, অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, ল্যাংড়া সুস্থ হয়ে যায়। এটা সব ধরনের তালার চাবি। যে এটা লাভ করল সেসব কিছুই লাভ করল।

দু'আর এ ধরনের ফলদানের কথায় তাবলীগের ইতিহাস ভরপুর। এই জিনিস তাবলীগের সাথিদেরকে এমন এক বাহ্যিক ও আত্মিক শক্তি দান করেছে যে, তারা অত্যন্ত নাযুক পরিস্থিতিতেও দৃঢ়পদ থাকেন। কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারা কাজ করতে ভয় পান না। দু'আকে তারা নিজেদের জন্য মুসা (আ.)-এর লাঠির মতো মনে করেন।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একাকী মেহনত করে ১৬ জন সাথি তৈরি করেছিলেন। তারা মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আজ মাত্র একজন জীবিত আছেন। তিনি হলেন পাকিস্তানের যিম্মাদার হাজী আবুল ওয়াহাব সাহেব। আল্লাহ পাক তার হায়াতকে দারায করুন।

প্রতিবাদ করতে এসে নিজেই চিল্লায় বের হয়ে গেল

মাওলানার বয়ান শুনে একবার এক লোক চিল্লার জন্য তৈরি হয়ে গেল। সফরে যাওয়ার পরে তার আব্বার চিঠি এল মাওলানার নামে যে, আমার ছেলেকে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন? আমি বৃদ্ধ মানুষ। তার আয়েই সংসার চলে। এতটুকু লিখেই সে ক্ষ্যান্ত হলো না বরং সরাসরি নিযামুদ্দীনে চলে এল। এসেই মাওলানার ওপর খুব ক্ষিপ্ত হলো যে, আমার ছেলেকে একেবারে বেকার বানিয়ে দিয়েছেন। এখন তো সে কোনো কাজের থাকল না। পরে সে ব্যক্তি হযরত মাওলানার বয়ানে বসল। পুরা বয়ান অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করল এবং এতই প্রভাবান্বিত হলো যে, নিজেও চিল্লার জন্য নাম লিখিয়ে দিল। অতঃপর মাওলানার পা ধরে মাফ চাইল যে, আগে তো ছেলেকে বিগড়ে দেয়ার অভিযোগ করেছিলাম, এখন তো আমি নিজেই বিগড়ে গেলাম। মাওলানা তার কথা শুনে হেসে উঠলেন।

একবার মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী (রহ.) মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কে দাওয়াত দিলেন। খাদেম দাওয়াতের খবর পৌঁছাতে এসে ভুলক্রমে ৮টার জায়গায় ৯টার কথা বলে গেল। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)ও ঠিক ৯টার সময় সেখানে উপস্থিত হলেন। সাথে ছিলেন মাওলানা মনজুর নুমানী। মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেব রাগান্বিত হয়ে বললেন, মাওলানা! আপনার কাছে সময়ের কোনো মূল্য নেই? মুসলমান তো এমন হয় না। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) চুপ থাকলেন। ফিরে আসার সময় মাওলানা মনযুর নুমানী সাহেব বললেন, আপনি তার নিকট কথাটা স্পষ্ট করে দিলেন না কেন? মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)

বললেন, তাবলীগের কাজ আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারাই নেবেন যে অন্যের ভুলকেও নিজের ভুল মনে করে।

মেওয়াত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাআত রওনা

বিশ্বের আনাচে-কানাচে আজ যখন তাবলীগি জামাআতের পদচারণ পরিলক্ষিত হয় তখন বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকে না যে, একজন দুর্বল, অসুস্থ ব্যক্তি একাকী কাজ শুরু করেছিলেন তার মধ্যে কী পরিমাণ ইখলাস ছিল। আল্লাহু আকবার! বটবৃক্ষের বীজ কত ক্ষুদ্র হয় কিন্তু সেটিকে যখন মাটির নিচে লুকিয়ে দেয়া হয় আর যথাযথ পরিচর্যা করা হয় তখন সেটা মহীরুহে পরিণত হয়। যার ছায়াতলে হাজারো পথিক শান্তির আশ্রয় নিতে পারে। অনুরূপভাবে মুমিনের ইচ্ছা এরাদাও প্রতিকূল পরিবেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দেখেও সে ঘাবড়ায় না বরং তার হিম্মত আরো বৃদ্ধি পায়। ইশক-মহব্বতের পথে মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকাটাই কামিয়াবী।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) একদিন নূহ নামক স্থানে লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। তাদের নিকট সময় চাচ্ছিলেন কিন্তু কারো নিকট থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। মাওলানার ওপর তখন একটা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং তিনি জোশের সাথে বলে উঠলেন, এই এলাকা থেকেই বিদেশে যাওয়ার জন্য জামাআত তৈরি হবে। কিন্তু তখন দূর-দূরান্তের সফর করলেও ওই পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না যতটুকু পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে নিজেদের এই এলাকায় সফর করলে।

মাওলানা মনজুর নুমানী (রহ.) বলেন, আমি তখন হতবাক হয়ে চিন্তা করছিলাম, এত কাছে তো কেউ বের হওয়ার জন্য হিম্মত করছে না। আর মাওলানা বলছেন, এখান থেকে বিদেশ যাওয়ার জন্যও জামাআত তৈরি হবে। এটা পাগলের প্রলাপ নয়তো কী! কিন্তু পরবর্তীতে আমার এই চোখ দেখেছে যে, উক্ত এলাকা থেকেই বিদেশের জন্য জামাআত তৈরি হয়েছে।

বস্তুত এটা ছিল হযরত মাওলানার একীন ও ইখলাসের বরকত যে, মেওয়াতের গোটা এলাকা, যা গুণ্ডা-বদমাশদের আড্ডা বলে পরিচিত ছিল সেখানকার অধিকাংশ মানুষ দাঈ হয়ে গেলেন। যাদের অনেকে আজও জীবিত আছেন। যাদের কথা শুনলে শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায়। দিলের পর্দা সরে যায়। হযরত মাওলানার জীবদ্দশাতেই তাবলীগের কার্যক্রম ভারতের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সে সময় দূর নয়, যখন তোমাদের জামাআত আরব এবং আমেরিকায় যাবে

আলহাজ মিঞাজী রহীম বখশ সাহেব একটি ইজতিমার চোখে দেখা অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

এই ইজতিমায় হযরতজী দীর্ঘ সময় ধরে বয়ান করেন এবং বলেন, দ্বীন শেখার জন্য সকলে জামাআতে নাম লেখান। এ কথা শুনে লোকেরা ঘাবড়ে গেল এবং একজনও নাম লেখাল না। হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) আসমানের দিকে অনেকক্ষণ মাথা তুলে রাখলেন। অতঃপর যখন মাথা নিচু করলেন, তখন তার চোখ ছিল অশ্রুতে পরিপূর্ণ। কিন্তু হাত দিয়ে তা মুছে ফেললেন, মাটিতে পড়তে দিলেন না। তারপর মজমাকে লক্ষ্য করে একটু রাগত স্বরেই বললেন, আজ আমি বার বার বলার পরও কেউ নাম লেখাচ্ছে না, আল্লাহর কসম! সে সময় বেশি দূরে নয়, যখন তোমাদের জামাআত আরবে যাবে, আমেরিকায় যাবে ও আফ্রিকায় যাবে। হযরতজীর এই বক্তব্যের এমনই প্রভাব পড়ল যে, তখনই দেড় শত লোক নাম লেখাল। সেই ইজতিমা থেকে ষোলটি জামাআত বের হলো। প্রত্যেক জামাআতে একজন করে আমীর, আর প্রতি চারটি জামাআতের জন্য একজন আমীরুল উমারা নির্ধারণ করে পুরা এলাকায় তাদের দিয়ে গাশত করানো হলো। এবং সেটা এভাবে করা হলো যে, চারটি জামাআতকে পাহাড়ের ওপর পাঠানো হলো, চারটি জামাআতকে পাহাড় ও সড়কের মধ্যবর্তী গ্রামসমূহে এবং অপর চারটি জামাআতকে দিল্লি ও ইলোরাগামী সড়কের দিকে এবং শেষ চারটি জামাআতকে যমুনার তীরবর্তী এলাকায় কাজ করার জন্য পাঠানো হলো। এই জামাআতগুলো স্ব স্ব এলাকায় নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করে দিল্লির জামে মসজিদে একত্রিত হলো।

লালকেল্লা থেকে ইংরেজদের পতাকা পড়ে গেল

এই উপলক্ষে সেখানে একটি ইজতিমা হলো, যাতে হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) তাশরীফ আনলেন এবং দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে জোরদার বক্তব্য রাখলেন। একপর্যায়ে অত্যন্ত জোশের সাথে বললেন, এটা সেই কাজ, যার দ্বারা বাতিল ধ্বংস হবে এবং লাল কেল্লার উপর ইংরেজদের যে পতাকা উড়ছে তা অবনমিত হবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত মাদানী (রহ.) যখন পতাকা সম্পর্কে এই ভাষণ দিচ্ছিলেন ঠিক তখনই লাল কেল্লার উপর উড়তে থাকা ইংরেজদের পতাকা হঠাৎ করেই পড়ে গেল। জামে মসজিদে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ এই দৃশ্য দেখে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। হযরত মাদানী (রহ.) তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, আমি একটা কাজের কথা বলছি, সেটা করো। স্লোগান দিয়ে সব জোশ খতম করো না। বয়ানের পরে হযরত মাদানী (রহ.) দু'আ করলেন এবং এই ইজতিমা থেকে কর্নাল, পানিপথ, সোনীপথ, কান্ধালা এবং সাহারানপুরের দিকে জামাআত পাঠানো হলো। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং

স্বীয় খান্দানের লোকদের দ্বারা তাদের খাতির সম্মান করালেন। শানদার দাওয়াত খাওয়ালেন এবং এখান থেকেই হযরত মাওলানা আট সদস্যবিশিষ্ট একটি জামাআত তৈরি করে থানা-ভবন প্রেরণ করলেন। এই জামাআত থানা-ভবনের আশপাশে খুব জমে মেহনত করল। আর এই সংবাদ ধারাবাহিকভাবে হযরত থানভী (রহ.)-এর খেদমতে পৌঁছতে থাকল। অবশেষে হযরত থানভী (রহ.)-এর আহ্বানে উক্ত জামাআত থানা-ভবনের খানকায় আগমন করল। হযরতের সাথে মুলাকাত ও ইস্তিফাদাহ হলো। হযরত থানভী (রহ.) তাবলীগি কাজের মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাহকীক করলেন।

অসুস্থ অবস্থায়ও মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর দাওয়াত জারি

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) তাবলীগের কাজ অত্যন্ত মনোযোগ, তড়প এবং দিলের ব্যাথার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। তার সারাটি জীবন এই কাজের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। অসুস্থতার সময়ও তিনি কিভাবে এই ফিকিরে সময় কাটিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা মঞ্জুর নুমানী (রহ.) বলেন, নামায ইত্যাদির জন্য দুজন খাদেম তাকে বিছানা থেকে উঠাত এবং তারাই আবার বিছানায় শুইয়ে দিত। অনেক সময় তার মধ্যে বসার মতো শক্তি না থাকা সত্ত্বেও তিনি সুন্নত-নফল তো বসে পড়তেন; কিন্তু ফরয নামায দাঁড়িয়ে জামাআতের সাথে আদায় করতেন। অথচ নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও তার মধ্যে থাকত না। খাদেমরা কোমর এবং বাহু ধরে উঠিয়ে কামরায় নিয়ে শুইয়ে দিত। কিন্তু দাওয়াতের কাজ এবং তাবলীগের মেহনতের জন্য তার মধ্যে যে জযবা আর দেওয়ানগী বিরাজ করত, তা এই সময় আরো বেশি করে ফুটে উঠত। একা থাকলে এই নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে থাকতেন। আর পাশে কেউ থাকলে এই কঠিন অবস্থায়ও তার সাথে দিলের দরদ নিয়ে এ ব্যাপারে আলাপ করতে থাকতেন। অসুস্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে যদি নীরব থাকতে বলা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা আর দ্বীনের তালীম, তারবিয়াত এবং তাবলীগের নবীওয়ালা যে তরীকা আমি যিন্দা করতে চাচ্ছি, জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকায় সেগুলো ছেড়ে দেয়া আমি কোনো অবস্থাতেই জায়েয মনে করি না। কেননা নামাযের মধ্যে কিয়াম করা যে ফরয এই ইলম এবং অনুভূতি আলহামদুলিল্লাহ উম্মতের মধ্যে বাকি আছে কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ইসলাহের জন্য চেষ্টা করাও যে ফরয, সেটা আজ আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি। অথচ এটা এমনই একটা ফরয, যার ওপর দ্বীনের অন্যান্য ফরজ নির্ভরশীল। তাই এ ব্যাপারে আমি নিজের জন্য কোনো রুখসতের অবকাশ দেখি না। হ্যাঁ, যদি বড় একটি জামাআত এই ফরযকে উপলব্ধি করে সে জন্য পরিপূর্ণ মেহনত শুরু করে তাহলে আমার কিছুটা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ হয়ে যাবে। কিন্তু সে রকম জামাআত তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমার জন্য এটা জায়েয নেই যে, আমি প্রাণহানির আশংকায় এই কাজ পরিত্যাগ করব কিংবা মুলতবি করব।

হযরত মাওলানার অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) কয়েক মাস লাগাতার অসুস্থ থাকার পর ১৩৬৩ হিজরীর ২১ শে রজব বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তিকাল করেন। যে রাতে ইন্তিকাল হয় সে রাতের শুরু থেকেই তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আগামী কাল কি জুমার দিন? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখ আমার কাপড়ে কোথাও নাপাকী লেগে আছে কি না। যখন জানলেন যে, কোথাও কোনো নাপাকী নেই, তখন খুব খুশি হলেন। চারপায়ী থেকে নিচে নেমে উযু করে নামায পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু শুশ্রূষাকারীরা নিষেধ করল। জামাআতের সাথে ইশার নামায শুরু করেছিলেন; কিন্তু বাথরুমে যাওয়ার বেগ হওয়ায় তা সম্ভব হলো না। পরে কামরার মধ্যে আরেক জামাআতে ইশা আদায় করলেন। নামায শেষে বললেন, আজকের রাতে খুব বেশি বেশি দু'আর ইহতিমাম করো এবং খুব দম করো। অতঃপর বললেন, আজকে আমার পাশে এমন লোকদের থাকা উচিত, যারা শয়তান এবং ফেরেশতাদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের কাছ থেকে মাগফিরাতের দু'আটি ভালোভাবে মুখস্থ করে নিলেন।

মুখে যিকির জারি থাকল। একপর্যায়ে বললেন, মনে চাচ্ছে আজ আমাকে গোসল করিয়ে নিচে নামিয়ে দাও। দু রাকাআত নামায পড়ি। দেখি নামাযে কী রং আনে। রাত ১২টার সময় হঠাৎ করে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। ডাক্তারকে ফোন করা হলে ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন। সারা রাত শুধু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবারের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। ফজরের আযানের পূর্বেই তিনি পরপাড়ে পাড়ি জমালেন আর সারা জীবনের ক্লান্ত-শ্রান্ত এক মুসাফির, যিনি সারাটি জীবন শান্তিতে একটু ঘুমাতে পারেননি, চিরস্থায়ী নিদ্রায় শায়িত হওয়ার জন্য মনজিলে মাকসুদের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

ফজরের নামাযের পরে অশ্রুর সমুদ্রের মধ্যে মাওলানা ইউসুফ সাহেব পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর পাগড়ি তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك سبحانك الله وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, সুধীমণ্ডলী!

আমাদের এখানে সমবেত হওয়া, এটি কোনো ওয়াজ-নসীহত শ্রবণের জন্য নয়। বরং আমরা স্বদেশ এবং বিদেশে কিছু ফেতনার শিকার। উম্মতে মুহাম্মদী বর্তমানে কিছু অভ্যন্তরীণ ফেতনার শিকার, যা এই উম্মাহর ঐক্য এবং সংহতিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এর ইহকালীন ক্ষতি হচ্ছে, মুসলমানরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ তারা সিসাঢালা প্রাচীরের মতো মজবুত থাকার জন্য আদিষ্ট। কিন্তু যখন এই ধরনের অভ্যন্তরীণ ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন, উম্মাহর সামগ্রিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। আর পরকালীন (আধ্যাত্মিক) ক্ষতি হচ্ছে, ইসলাম হচ্ছে কিছু দৃঢ় বিশ্বাস এবং কাজকর্মের সমষ্টি। আক্বীদা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দলিল হতে হয় অত্যন্ত মজবুত। ইয়াকীনের চেয়ে উচ্চস্তরের।

আপনারা অবশ্যই সম্যক অবগত আছেন যে, খবর (সংবাদ) خبر একটি পরিভাষা। খবর বলা হয় যার বাহককে সত্য অথবা মিথ্যার অভিধায় গুণান্বিত করা সম্ভব। ما يحتمل الصدق والكذب খবরের চেয়ে ওপরের হচ্ছে ইলম। ইলম উপকারী এবং ক্ষতিকারক উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার ওপরে হচ্ছে ইয়াকীন। ইয়াকীনের সম্পর্ক কখনো বাস্তব বিষয়ের সাথে হয়, কখনো সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভ্রান্ত বিষয়ের সাথে হয়।

উলামায়ে আক্বায়েদ তথা যারা আকীদা নিয়ে গবেষণা করেন, আকীদার ক্ষেত্রে খবর, ইলম অথবা ইয়াকীন কোনো শব্দই ব্যবহার করেননি। বরং আকীদা নামে নতুন একটি শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। যেমন ইসলামও তার প্রত্যেক বিধিবিধানের জন্য নতুন পরিভাষার গোড়াপত্তন করেছে, যেমন সালাত, একটি পারিভাষিক শব্দ, যাকাত পারিভাষিক শব্দ। আকীদার ভিত্তি খবর, ইলম এবং ইয়াকীনের অনেক উর্ধ্বে।

এ ধরনের ফেতনা যখন উঠবে তখন উম্মত আকীদার ক্ষেত্রে নড়বড়ে হয়ে যাবে। এবং তারা বিভিন্ন ভ্রান্তির শিকার হবে। সে সন্দেহ হতে পারে আল্লাহর একাত্মবাদকে নিয়ে, রাসূলের নবুওয়াত নিয়ে, ইসলামের সর্বজনীনতা নিয়ে। মোদ্দাকথা, ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে পড়বে। হযরত শাহ আবরারুল হক (রহ.) প্রায় বলতেন, আকায়েদে ইসলাম হাকায়েকে ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের আকীদাই তার মৌলিক ভিত্তি। প্রত্যেক বস্তু পরিবর্তনশীল। কিন্তু হাকীকত পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। আকীদার ভিত্তি হচ্ছে হাকীকতের ওপর। তার মূল ভিত হচ্ছে, আল্লাহর অসীম জ্ঞান। পবিত্র কুরআন আমাদের সমস্ত আকীদার মৌলিক ভিত্তি। এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে হাদীসও বলা যেতে পারে, সুন্নাতও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটিও আমাদের আকীদার মৌলিক উৎস। কুরআন-হাদীস উভয়টিই ইয়াকীনি তথা অকাট্য।

আকীদা প্রমাণিত হওয়ার পন্থা তিনটি। ১. কুরআন মজীদ ২. হাদীসে নববী। ৩. ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। যখন নতুন নতুন ফেতনার উদ্ভব হয়, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের আকীদায়ও চিড় ধরে। এই কথা বলা বড়াবাড়ি হবে না যে, তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত লোকের সমতুল্য হয়ে যায়। ঈমানের আলোকচ্ছটা সরে গিয়ে তাদের অন্তরে নেমে আসে প্রগাঢ় অন্ধকার। বাহ্যিকভাবে মুসলমান মনে হয়, কিন্তু চিত্তে অবিশ্বাসের প্রেতাত্মা। আদমশুমারিতে তারা মুসলমান থাকবে ঠিকই; কিন্তু বাস্তবে তারা মুসলমান থাকবে না। একেই বলা হয় ذهنى ارتداد মনস্তাত্ত্বিক নাস্তিক্যবাদ।

মুরতাদ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ প্রতিমার পূজা-অর্চনা শুরু করে দেবে, মুরতাদের এক অর্থ এটাও যে, মুসলমান ইসলামী কৃষ্টি-কালচার এবং আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দিহান হয়ে উঠবে। মনস্তাত্ত্বিক এই নাস্তিক্যবাদ পুরো উম্মতকে গ্রাস করে নিচ্ছে। অনেক কেতাদুরস্ত শিক্ষিত ডিগ্রিধারী, কিন্তু ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে সে নিঃস্ব, রিক্ত। যখনই কোনো ফেতনার দুয়ার খোলে, তখন উম্মতের মাঝে এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে অবিশ্বাস্যগতিতে। এগুলো কি শুধু বর্তমানে হচ্ছে? পূর্বে কি এ ধরনের ছিল না? না, বরং ইসলামের স্বর্ণালি যুগের যখন অবসান ঘটে, তখনই

এই মনস্তাত্ত্বিক নাস্তিক্যবাদের সূচনা হয়। এগুলো নবআবিস্কৃত কোনো বিষয় নয়, বরং সাহাবীদের যুগ হতে এর ধারাপরম্পরা।

কিছুক্ষণের জন্য চৌদ্দশত বছর পূর্বের প্রেক্ষাপট স্মরণ করুন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী প্রজন্মকে তাবেঈ বলা হয়। তাবেঈনরা সত্যের মাপকাঠি নয়। শুধুমাত্র ওই তাবেঈনরাই সত্যের মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত হবে, যারা সাহাবীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করবে। যারা তাদের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তারা সত্যের মাপকাঠি নয়। এবার আসুন ওই সব বর্ণনাকারী সম্পর্কে, যাদের মধ্যস্থতায় আমরা হাদীসের ভাণ্ডার লাভ করেছি। সাহাবী সম্পর্কে তো কোনো সমালোচনা নেই। তাদের পর রয়েছে তাবেঈ, তাদের ওপর মুহাদ্দিসীনরা বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা করে থাকেন। সমালোচনা করার অর্থ হলো, তাদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে এদের পূর্ণ আস্থা নেই। সব সাহাবী বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং তাদের সাক্ষী নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, যে বিষয় সম্পর্কে সাহাবীরা সাক্ষ্য দেবেন যে, এটি দ্বীন, তা দ্বীন হিসেবে পরিগণিত হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে কোনো সাহাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। এই আকীদার উৎস কী? কুরআন এবং হাদীস থেকেই এই আকীদা প্রমাণিত হয়। উভয় উৎসে এর সপক্ষে ভূরি ভূরি নজির পাওয়া যায়। কুরআনে সাহাবীদের প্রশস্তিমূলক অনেক আয়াত রয়েছে। তাদের সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততার ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা সুস্পষ্ট। যত উত্তম গুণাবলি হতে পারে, কুরআন সে গুণাবলিতে সাহাবীদেরকে ভূষিত করেছে। সামগ্রিকভাবেও তাদের গুণগান গাওয়া হয়েছে। আবার অনেকের ব্যাপারে আলাদাভাবেও প্রশংসা করা হয়েছে। এজন্যই আমাদের আকীদা হচ্ছে, সমস্ত সাহাবী নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, তাবেঈন সম্পর্কে এই আকীদা পোষণ করি যে, প্রত্যেক তাবেঈ বিশ্বস্ত নয়। সাহাবীদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা কোনো সাহাবী বিদআতী হতে পারে না। কেননা, বিদআতীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত। কোনো সাহাবী ফাসেক (পাপিষ্ঠ) হতে পারে না। কেননা ফাসেকের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। সাহাবায়ে কেরাম এই ধর্মের প্রথম সাক্ষী। সাক্ষীর জন্য বিশ্বস্ত, সৎ এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া অতীব জরুরি। কোনো সাহাবী মুনাফিক (কপট) ছিলেন না। কোনো সাহাবী নিজের পক্ষ থেকে ধর্মে সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি। তাদের সতর্কতার এই অবস্থা ছিল, কোনো কথা রাসূল (সা.)-এর দিকে সম্পৃক্ত করতে তারা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, যে সমস্ত লোক সারাক্ষণ সাহাবীদের সান্নিধ্যে থাকে, তাদের সাথে ওঠাবসা করে, লেনদেন করে, শরীয়ত তাদেরকে সত্যায়িত করছে না। বরং তাদের নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য এই শর্তারোপ করেছে যে, তারা সাহাবীদের অনুসৃত পথের ওপর থাকবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আসমাউর রিজালের বিশাল বিশাল গ্রন্থাদি দেখা যেতে পারে। অনেক বর্ণনাকারী আছেন যারা সাহাবায়ে কেরামের শিষ্য, কিন্তু মুহাদ্দিসীনরা তাদেরকে মিথ্যুক, দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, অনেক তাবেঈ হচ্ছেন সাহাবীদের সমসাময়িক, স্থানও অভিন্ন, বংশও এক, কিন্তু এর পরও তাদের জন্য সাহাবীদের অনুসরণকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই চৌদ্দশত বছর পর বরং কেয়ামত পর্যন্ত কোনো প্রজন্ম যদি সাহাবীদের বাদ দিয়ে দীন চর্চা করতে চায়, দ্বীনের উৎকর্ষ সাধন করতে চায়, তা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এটি কোনো নিছক মনগড়া কথা কিংবা গালগল্প নয়, বরং এটি আমাদের অন্যতম মৌলিক আকীদা। অনেকেই অবলীলায় বলে ফেলেন যে, অমুক দল সাহাবীর আমলকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন, অমুক সম্প্রদায় তাদের আমলকে সত্যে মাপকাঠি স্বীকার করেন না। কথাটি খুব সহজেই বলে ফেলেন। অথচ এটি মৌলিক বিষয়। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো ইসলামী দল, সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে না নেবে। এটিই পুরো ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি, কোনো বিশেষ দলের স্মারক নয়। এখানে আরেকটি বিষয় স্মরণ করুন, সাহাবাদের যুগে যেসব ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা কোন ধরনের ফেতনা ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা কিভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন? যদি বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত যত ফেতনাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তারও প্রতিরোধ করতে হবে ঠিক সে পন্থায়। সাহাবীদের যুগে যখন নতুন নতুন ফেতনা গজাতে আরম্ভ করে, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত মাপকাঠিকে কষ্টিপাথর নির্ধারণ করেন। ওই কষ্টিপাথর ছিল ما انا عليه واصحابى আহলে হক হওয়ার জন্য সাহাবীদের পূর্ণ অনুসরণের বিকল্প নেই। আর যারা

তাদের রাস্তা থেকে বিচ্যুত তারা বাতিল হিসেবে পরিগণিত হবে। কারা কারা সাহাবীদের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে? তাদের প্রত্যেকের যদি আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়, তাহলে মজলিশ অনেক দীর্ঘ হবে। দল হিসেবে যারা বিচ্যুত হয়েছে তন্মধ্যে দুটি দল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এক. রাফেজী, দুই. খারেজী। রাফেজী, রফজ থেকে নির্গত। অর্থ সঙ্গত্যাগ করা। তারা যেহেতু সাহাবীদের সঙ্গত্যাগ করেছে, তাই তাদেরকে রাফেজী বলা হয়। সাহাবীদের যত সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে, সবগুলোকে তারা ধর্মে নবআবিষ্কৃত বিষয় বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

যেমন, রাসূল (সা.)-এর স্বর্ণযুগে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) সেগুলোকে একত্রিত করেন। রাফেজীরা এখনো বলে থাকে, হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন মজীদে অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছেন।

হযরত ওমর (রা.) দ্বীনের যে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন রাফেজীরা তাকেও দ্বীনে নবআবিষ্কৃত বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। হযরত উসমান (রা.) স্বীয় খেলাফতকালে পবিত্র কুরআনের সমস্ত কপি একত্র করে কুরাইশের লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করে সাতটি কপি তৈরি করে ইসলামী সাম্রাজ্যের সাতটি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে প্রেরণ করেন। শীয়ারা ওই কাজকে বিদআত বলে প্রপাগান্ডা চালায়।

আপনারা দেখুন, একটি দল যুগে যুগে সাহাবীদের কর্মপদ্ধতিকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। পরবর্তীতে রাফেজীরা নিজেদেরকে আহলে বায়তের (রাসূল সা. এর পরিবার) হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালায়। এভাবে তারা সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বায়তের মাঝে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তারা সাহাবীদের অনুসৃত পথ থেকে সরে আসতে আসতে ইসলামের গণ্ডি থেকেই বের হয়ে যায়। সে যুগে আরেকটি নতুন দলের উদ্ভব ঘটে, যারা ছিল মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী। তাদের খারেজী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল, কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিই অধিক সঠিক। ফলে তাদের আর সাহাবীদের মাঝে মতের অমিল হয়ে গেল। তখন স্পষ্ট কথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল যে, সাহাবীদের জ্ঞান-বুদ্ধিই বিশুদ্ধতার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাদেরকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করলেন। তাদের মুখোশ উম্মাহর সামনে উন্মোচিত করেন। তাদের পথভ্রষ্টতার একমাত্র কারণ ছিল, পূর্ববর্তীদের সাথে ধৃষ্টতা আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, এই উভয় চিন্তা দর্শন সাহাবীদের যুগ থেকে চলে আসছে।

সেই দিন থেকে এই মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয় যে, যারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করবে না, তাদেরকে হয়তো খারেজী অথবা রাফেজী গণ্য করা হবে। তখন থেকে দুটি আলাদা মক্তবে ফিকর (চিন্তার বাতিঘর) প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এক. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। সুন্নাত থেকে উদ্দেশ্য, নবীজির কর্মপন্থা আর জামাআত থেকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামাআতই উদ্দেশ্য। আপনারা অবশ্যই সম্যক অবগত আছেন যে, এই উভয় শব্দের উৎস কোথায়? নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ما انا عليه واصحابى এই হাদীস থেকে জামাআত শব্দটির উৎপত্তি। আর لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة সহ আরো অসংখ্য আয়াত, যেখানে নবী করীম (সা.)-কে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছে, সেখান থেকে সুন্নাত শব্দটির উৎপত্তি। অর্থাৎ সুন্নাতকেও আমরা ইসলামের মূলনীতি হিসেবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি।

(২) খারেজী এবং রাফেজী।

আমরা এখন এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কেয়ামত পর্যন্ত যারা সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করবে, তারাই আহলে হক তথা সত্যপন্থী। আর যারা তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করবে না, তারা ভ্রান্ত মতালম্বী। তারা হয়তো খারেজী দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত হবে। অথবা তাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ ঘটবে রাফেজী দর্শনের বিষাক্ত রেণু। হ্যাঁ, তারা তাদের নাম পরিবর্তন করতে পারে। কেননা, নাম পরিবর্তন একটি গৌণ বিষয়, এর মাধ্যমে মূল বাস্তবতায় কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।

এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, যে বিষয়টি অতীতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখনো এবং ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে, তা হচ্ছে ইসলামের সংরক্ষণ। যা ইশাআতে ইসলাম তথা ইসলামের প্রচার প্রসারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই ইসলামের প্রচার-প্রসারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তীরা ইসলামের সংরক্ষণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে ইসলামের সংরক্ষণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এমন যুগে বসবাস করছি, যে

যুগে আমাদের এই সংস্কারমূলক কাজকে শত্রুরা অনৈক্য সৃষ্টিকারী কাজ বলে সারা বিশ্বে বদনাম রটাচ্ছে। এখন মিডিয়ার যুগ। খুব সহজেই কারো কুৎসা রটাতে চাইলে তাকে কোনো কুৎসা উপাধি দিয়ে দিলেই সে ওই নামে সারা বিশ্বে কুখ্যাতি অর্জন করে।

আপনারা নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন, হকের মিত্র পৃথিবীতে সব সময় স্বল্প হয়। ঐক্য সংহতির পক্ষে কাজ করার জন্য অনেক লোক পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ওই আসনে সমাসীন হওয়ার প্রশ্ন আসে, যে আসনে সমাসীন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবাতাবেঈন, তখন অবিচল লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। কেননা শত্রুরা আমাদের সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডকে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কাজ বলে সারা বিশ্বে কুৎসা রটাচ্ছে।

এজন্য আমি প্রায় সময় বলে থাকি, ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডনবিষয়ক যত কিছু হয়, তা অবশ্যই সংশোধনমূলক কাজ, মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কার্মকাণ্ড নয়। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই কাজকে ইসলাহী কাজ হিসেবে আঞ্জাম দিয়েছেন। খারেজী এবং রাফেজীদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের অবিস্মরণীয় কীর্তি ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায়।

সাহাবীদের পর আসল বনু উমাইয়া আর বনু আব্বাসিয়ার শাসনামল। আপনারা বিভিন্ন কিতাবে নিশ্চয় পড়েছেন, এই দুই বংশের খলীফাদের সাথে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম মালেক (রহ.)-এর দ্বন্দ্ব চরমে উপনীত হয়েছিল। আপনারা আহলে বায়তের ইতিহাসে পাবেন, খোলাফায়ে বনু উমাইয়ার বিরুদ্ধে হযরত যায়দ ইবনে আলী (রহ.) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এক স্থানে লিখেছেন, خروجه يضاهى خروج رسول الله ﷺ يوم بدر তিনি কে? তিনি আলী যাইনুল আবিদীন। খোলাফায়ে বনু উমাইয়া যখন স্বেচ্ছাচারিতার চরম সীমায় উপনীত হলো, তারা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ইচ্ছেমতো হস্তক্ষেপ করতে লাগল, জুমার খোতবা বসে দিতে আরম্ভ করল, তখন এদের বিরুদ্ধে হযরত যায়দ (রহ.) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যেহেতু অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি হযরত যায়দকে বিরাট অংকের আর্থিক সহযোগিতা করেন এবং তার এ যুদ্ধকে রাসূল (সা.)-এর বদর যুদ্ধের সাদৃশ্য বলে ফতোয়া প্রদান করেন। তার এ বিদ্রোহ কোন ধরনের বিদ্রোহ ছিল? এটি ছিল ইসলাহী তথা সংশোধনমূলক এবং গঠনমূলক। কারণ, বনু উমাইয়ার বাদশাহরা ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা আরম্ভ করে দিয়েছিল।

আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনী পড়ি। কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটের ওপর চিন্তা-ভাবনা করি না। যখন ইমাম সাহেব (রহ.)-এর কাছে খোলাফাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন আসত, তখন তিনি বলতেন, ভাই! আমি সৈন্যও নই, নিঃস্ব-অনাথও নই এবং সরকারি কোনো কর্মচারীও নই। তিনি কিভাবে তাদের উপহার সামগ্রী ফেরত পাঠাতেন তা তার জীবনীতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে হাদিয়া এলে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতেন, আমি এর উপযুক্ত নই।

আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের এসব কর্মকাণ্ড আদ্যোপান্তই ছিল সংস্কারমূলক। সে যুগে এসব কর্মকাণ্ডকে মতবিরোধ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড বলে অপপ্রচার চালাত খারেজী এবং রাফেজীরা।

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের কাছ থেকে এসব স্বচ্ছ এবং নিষ্কলুষ চিন্তা দর্শনের উত্তরাধিকারী হয়েছি। আমরা দ্বীনের এই স্রোতস্বীনী নদীতে অবগাহন করেছি। আমরা নির্দিষ্ট কিছু মাসআলার ভেতর সীমাবদ্ধ নই। আমাদের সব মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমায়ে উম্মত তথা, উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং কিয়াসে সরীহ তথা, স্পষ্ট কিয়াস।

কোনো স্থানে যদি আমাদের বিশেষ মাসআলা হিসেবে কোনো মাসআলা পাওয়া যায়, তাহলে তার বাস্তবতা শুধু এটুকুই যে, পৃথিবীর কোথাও যদি অপশক্তি কোনো মাসআলাকে বিকৃত করে উম্মাহর সামগ্রিক শক্তিকে বিনষ্ট করতে চায়, তাহলে আহলে হক সেখানে তার প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এজন্য বাতিলদের পরিচয় কোথাও ফাতেহা, চল্লিশা বা তীজা দিয়ে। আবার কোথাও তাদের পরিচয় রফয়ে ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন এবং ইমামের পেছনে কেরাআত পড়া নিয়ে। কোথাও তাদের পরিচয় রব, ইলাহ, দ্বীন, হুকুমতে ইলাহিয়্যাহ তথা কয়েকটি পরিভাষা দিয়ে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই ভ্রান্ত দলের উদ্ভব হয় সেখানেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সত্যপন্থী আলেমরা তাদের প্রতিরোধে দ্বীনের অবিকৃত এবং বাস্তব চেহারা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করতে মাঠে-ময়দানে কাজ আরম্ভ করেন। তাই আমাদের নির্দিষ্ট কোনো মাসআলা নেই। কিন্তু কেউ যদি বাতিলদের বিশেষ মাসআলার ওপর কোনো আর্টিকেল রচনা করতে চায় আমি মনে করি, এর জন্য তথ্য-উপাত্তের কোনো অভাব হবে না। খারেজীদের

নির্দিষ্ট বিশেষ আসআলা কয়টি? রাফেজীরা কয়টি মাসআলা নিয়ে পুরো ইসলামী সাম্রাজ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করেছে? স্বেচছাচারী শাসকদের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা কয়টি? তাদের মূল টার্গেট হচেছ, একটি বিশেষ মিশনকে সামনে রেখে ইজতিহাদের আড়ালে নিজেদের দূরভিসন্ধিকে বাস্তবায়নের যুগপৎ প্রচেষ্টা চালানো।

তাদের কাছে তো ইজতিহাদের ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই। কারণ ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকলে তো প্রত্যেকের ইজতিহাদের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, তাদের ইজতিহাদের ফলাফল অভিন্ন। বাংলাদেশের গায়রে মুকাল্লিদরা যেমন উচ্চস্বরে আমীন বলে, তেমনি পাকিস্তানি গায়রে মুকাল্লিদদের অবস্থাও অভিন্ন। ইজতিহাদের অভিন্ন ফলাফলের এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয় স্বঘোষিত মুজতাহিদদের প্রসবিত ইজতিহাদের।

কিন্তু তারা ভ্রান্ত মতাদর্শী হয়েও নিজেদের মতবাদ প্রচার প্রসারের জন্য যে দরদ আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালায়, অত্যন্ত আফসোসের সুরে বলতে হয়, আমরা সত্যপন্থী হয়েও দরদ আর প্রচেষ্টায় তাদের চেয়ে পিছিয়ে কেন? আমাদের মধ্যে যদি সামান্যতম চেতনাও থাকত, তাহলে কোনো অপশক্তি আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারত না ইনশাআল্লাহ। কেননা আমাদের দ্বীন, দ্বীনের মূলনীতি, সব কিছুই সংরক্ষিত। দ্বীনের বিধিবিধানকে আমাদের চার ইমাম এত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত করেছেন, কোনো কুলাঙ্গার যদি তাতে সামান্যতম বিকৃতির অপপ্রয়াস চালায় সাথে সাথে তাকে পাকড়াও করা হবে।

এজন্য আমি প্রায় বলে থাকি, আমরা যে কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নেমেছি, তাতে আমাদের পূর্ণ আস্থা থাকা চাই যে, আমরা সংশোধনমূলক কাজ করছি। কেননা, ভ্রষ্টতা যদি আকীদার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তার সংশোধন অতিব জরুরি। ভ্রান্তি যদি কর্মপন্থায় হয় তারও সংশোধনের কোনো বিকল্প নেই। এই বিষয়ে দুঃখ করার কোনো কারণ নেই যে আমরা মতবিরোধপূর্ণ কাজ করছি।

অনেক লোক আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত না হওয়ায় আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, আপনারা নেতিবাচক কাজ করছেন। আপনারা শাখাগত ছোট ছোট বিষয় নিয়ে উম্মাহর সামগ্রীক সংহতিতে ফাটল ধরাচেছন। আপনারা উম্মাতকে তালগোল পাকিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করছেন। আচ্ছা, যত দলই হোক না কেন, ওই দলই সত্যের ওপর হবে, যে দল সাহাবীদের মতাদর্শের ওপর অটল এবং অবিচল থাকবে।

আমাদের উলামায়ে আহলে হকের চেতনার বাতিঘর হচেছন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

যারা উম্মাহর মাঝে ঐক্যের প্রত্যাশী, তারা সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ স্বীকার করার সাথে সাথে সব ঝগড়া মিটে যায়। কিন্তু তারা তা করতে মোটেও প্রস্তুত নয়। কারণ তারা সাহাবায়ে কেরামকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে মোটেও প্রস্তুত নয়।

যদি সাহাবীদেরকে বাদ দিয়ে কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠাও হয়, তা যে বেশি দিন টেকসই হবে না, তা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। এজন্য আমি আপনাদেরকে যে কাগজটি দিয়েছি সেখানে বিভিন্ন ভ্রান্ত দল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। মুসলমানদের মধ্যে আকীদাগত দিক থেকে কয়েকটি দল রয়েছে। আমরা জনসাধারণকে বিষয়টি এভাবে বলে থাকি, সঠিক আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতিব জরুরি। কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া, এটি উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। যেমন ইউনানি দার্শনিকদের অভিমত হচ্ছে, আসমান ফাটতে পারে না। তারা এটা থেকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, মেরাজ সংঘটিত হয়নি। অথচ অকাট্য প্রমাণাদি থেকে এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, ইসরা (মেরাজ) সন্দেহাতীতভাবে সংঘটিত হয়েছে। উলামায়ে কেরাম দ্বীনের ক্ষেত্রে কত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, দেখুন! জনসাধারণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়, মেরাজ সত্য, এ কথা আপনারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন। কিন্তু উলামায়ে কেরাম মেরাজ এবং ইসরার মাঝে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য করে থাকেন যে, যতটুকু কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে অর্থাৎ ইসরা তা অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত। আর এর ওপরের ভ্রমণ অর্থাৎ, মেরাজ, তা হাদীস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণিত। যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকুই দিতে হবে। উলামায়ে কেরাম তখনকার জনসাধারণকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, ইউনানিদের এই দর্শনটিই ভুল। কিন্তু এই দর্শনটির ভ্রান্তি কোথায়, তা জনসাধারণকে কিভাবে বোঝানো যাবে? তৎকালীন দার্শনিকরা এই সব সন্দেহ উত্থাপন করার মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের আকীদার মূল ভিতকে নড়বড়ে করার অপপ্রয়াস চালালে উলামায়ে কেরাম তাদের দাঁতভাঙা জবাব প্রদান করেন। বাতিলের আকীদা বিধ্বংসী ভয়াল থাবার করালগ্রাস থেকে উম্মতকে হেফাজত করেন।

ফেকাহর বিধিবিধান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন চার মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আকীদার মাসআলা বিশ্লেষণের

ক্ষেত্রেও সমগ্র উম্মাহ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ১. মুতাজিলা,২. সলফিয়্যা, ৩. আশায়েরা, ৪. মাতুরীদিয়াহ।

উলামায়ে কেরাম মাত্রই জানেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে এদের নামই আলোচনাই আসে। আবুল হাসান আশআরী, আবু মনছুর মাতুরীদি এদের আলোচনাই ভরপুর পুরো ইলমুল আকায়েদ। হানাফীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতুরীদিয়াহ, শাফেয়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশায়েরা মতাদর্শ অবলম্বন করে থাকেন। অধিকাংশ হাম্বলীদের ঝোঁক সালাফিয়্যাহর প্রতি। আর মুতাজিলাদের দর্শন অত্যন্ত অদ্ভুত। তারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং গুণাগুণ সম্পর্কীত আয়াতের অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন, আমাদের আলেমরা তার সাথে একমত নয়।

এসব দলের মধ্যে যারা ইখলাসের ভিত্তিতে মতবিরোধ করেছে মহান আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করবেন। কিন্তু তারা কেউ সরাসরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হননি। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব দলের সৃষ্টি হয়, তারা নির্দিষ্ট বিশেষ কিছু মাসআলা সামনে রেখে সরাসরি আহলে হকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের মৌলিক দর্শনে আঘাত হানতে অপচেষ্টা চালায়।

অর্থাৎ, পুরো দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট মাসআলার প্রচার-প্রসারকে তারা ঈমান মনে করে থাকে। যেমন, জামাআতে ইসলামী, তথাকথিত আহলে হাদীস, বেরলভী।

আপনারা একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন, কোনো মুসলমান যদি তাদের নির্দিষ্ট মাসআলাগুলো বিশ্বাস করে তাহলে সে তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। দ্বীনের অন্য বিষয়ে তার পদচারণা না থাকলেও ।

অন্যদিকে দ্বীনের ধারক-বাহক উলামায়ে কেরাম, তারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। কারণ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা ধর্মে পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তারা খণ্ডিত অংশকে দ্বীন মনে করেন না। তাই তারা কিছু মাসআলাকে নিজেদের বিশেষ মাসআলা হিসেবেও চিহ্নিত করেন না।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ:
হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

‘উমরী কাযা’-এর শরয়ী বিধান

মুফতি শরীফুল আজম

ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হচ্ছে নামায। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এবং বহু হাদীস শরীফে নামাযের প্রতি জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে واقيموا الصلاة واتوا الزكواة আর নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। (সূরা আল-বাকারা-৪৩) কোনো বিষয়ে এমন নির্দেশসূচক বাক্য ব্যবহার করা হলে তা আদায়ের ব্যাপারে কোনো রূপ ছাড় দেয়া হয় না। কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ে অপারগ হলে পরে অবশ্যই কাযা করে দিতে হবে। কোনো অজুহাতে মাফ পাওয়ার আশা করা যাবে না।

حسامى ص٣٨ :فى حكم الواجب بالامر وهو نوعان :اداء وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقهِ وقضاء وهو اسقاط الواجب بمثل من عنده شامى ٢/٦٣ :الاداء تسليم عين الثابت بالامر والقضاء تسليم مثل الواجب به

নামায, রোজা, হজ্জ যাকাত যা-ই বলুন না কেন, কোনো কারণবশত সঠিক সময়ে এ সকল হুকুম পালনে ব্যর্থ হলে তা মাফ হয়ে যায় না বরং অবধারিতভাবে কাযা আদায় করতে হয়। কেননা এগুলো মূলত আল্লাহর ঋণ। যেভাবে মানুষের ঋণ দীর্ঘদিন বকেয়া পড়ে থাকলে শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না বরং কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করে আদায় করতে হয়। অনুরূপ আল্লাহর হক নামায ও দীর্ঘদিনের বকেয়া রয়ে গেলে কাযা করে দেয়া আবশ্যক

فدين الله احق ان يقضى (بخارى)

অর্থাৎ আল্লাহর ঋণ কাযা করে দেওয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। (বুখারী ১৯৫৩)

তার নাম কাযা বা উমুরী কাযা যা-ই রাখা হোক না কেন, হিসাব করে সকল নামায আদায় করাই হচ্ছে শরীয়তের বিধান ।

হাদীসের নির্দেশনা

হাদীস শরীফে যেভাবে কাযা নামায-সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে,

অনুরূপ নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের বাস্তব দু-একটি ঘটনাও বিদ্যমান রয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাছ (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন

من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها ، لا كفارة لها الا ذلك

“কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নামায পড়তে ভুলে যায় তবে তার কর্তব্য হচ্ছে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়া, এছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই।” সহীহ মুসলীম শরীফের বর্ণনায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، فان الله عزوجل يقول :اقم الصلاة لذكرى

তোমাদের কেউ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে অথবা অবহেলা করে ছেড়ে দিলে সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘আমার স্মরণ এলে নামায কায়েম করো।’ (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১৫৬৯)

নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় এসেছে-

سئل رسول الله عن الرجل يرقد عن الصلاة او يغفل عنها قال :كفارتها ان يصليها اذا ذكرها

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে যে নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে অথবা অবহেলার দরুন ছেড়ে দেয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এর কাফফারা হচ্ছে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে ওই নামায পড়ে নেবে। (নাসাঈ শরীফ ১/৭১)

এ সকল হাদীসের মধ্যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যে ওয়াক্ত মতো নামায আদায় না করলে কর্তব্য হচ্ছে সতর্ক হওয়ার পর কাযা করা। চাই ওই নামায ভুলে বা নিদ্রাবস্থায় অথবা অবহেলার দরুন ছুটে থাক। সর্বাবস্থায় কাযার বিধান কার্যকর করা হয়েছে। এ সকল হাদীসে তিনটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়- نسى، رقد، غفل، অর্থাৎ ঘুম, ভুল এবং অবহেলা। ফলে সর্বক্ষেত্রের হুকুমের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এখানে এমন ফাঁকফোকড় বের করার অবকাশ নেই যে, অনিচ্ছায় নামায ছুটে গেলে কাযা করবে আর ইচ্ছাকৃত হলে কাযা লাগবে না তওবা করে নিতে হবে।

তাছাড়া এই মূলনীতি বাতলে দেয়ার সময় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের কোনো সংখ্যাও নির্ধারিত করে দেননি যে, এই পরিমাণ হলে কাযা করতে হবে এর চেয়ে বেশি হলে কাযা লাগবে না, তওবা করতে হবে। বরং সর্বক্ষেত্রে একই হুকুম। অর্থাৎ কাযা করতে হবে।

একটি বাস্তব উদাহরণ

খন্দকের যুদ্ধের সময় নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব নামায ধারাবাহিকভাবে রাতের বেলা কাযা করেন। হাদীসগ্রন্থসমূহে যার বিশদ বিবরণ রয়েছে। (বুখারী হাদীস নং ৫৯৬, তিরমীজী হাদীস নং ১৭৯) এখানেও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা বলেননি যে, এর চেয়ে বেশি নামায ছুটে গেলে কাযা

করতে হবে না।

সর্বস্বীকৃত মূলনীতি

শরীয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে যখন ব্যাপক কোনো হুকুম প্রবর্তন করা হয় তখন এর খুঁটিনাটি বিষয়ে ভিন্ন কোনো হুকুম জারি করার প্রয়োজন হয় না। যেমন পবিত্র কুরআনে রোযা ফরজ হওয়ার হুকুম উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময় রোযা পূর্ণ করে নিতে হবে। (সূরা আল বাকারা ১৮৪)

এখানে ব্যাপক হুকুম এসেছে যে, অসুস্থতা বা সফরের কারণে রমজানের রোযা রাখতে না পারলে পরবর্তীতে তার কাযা করতে হবে। এখানে এ কথা বলা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই যে, এটা এক রমজানের নাকি দুই বা ততধিক রমজানের রোযা ছুটে যাওয়ার হুকুম। বরং ব্যাপক হুকুম দেয়া হয়েছে যে রোযা ছুটলে কাযা করতে হবে। ফলে রোযা ছুটে যাওয়ার সকল সূরত এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ দুই বা ততোধিক রমজানের রোজা কাযা করার পৃথক দলিল দাবি করে তবে এটা যেমন অনভিজ্ঞতার পরিচয় হবে, ঠিক তেমনি দীর্ঘদিনের কাযা নামাযের ভিন্ন দলিল দাবি করাও মূর্খতার পরিচায়ক হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে খন্দকের যুদ্ধে কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা করে দেখালেন এটা যদি দীর্ঘদিনের কাযা প্রমাণে যথেষ্ট না হয়, তবে কি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘদিন কাযা করে দেখাবেন?

যদি কেউ উল্লিখিত হাদীসসমূহের ব্যাপক হুকুম থেকে দীর্ঘদিনের কাযার হুকুম ভিন্ন করে ঠিক করতে চায়, তবে এর সপক্ষে ভিন্ন দলিল পেশ করা তারই দায়িত্ব। কুরআন-সুন্নাহ থেকে পারলে এমন কোনো দলিল পেশ করুক, যার দ্বারা দীর্ঘদিনের কাযার পৃথক হুকুম সুস্পষ্ট প্রমাণিত হতে পারে। অন্যথায় এই ব্যাপক হুকুমই বলবৎ থাকবে এবং স্বল্প ও দীর্ঘদিনের কাযার একই হুকুম হবে। অতএব ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বা কমবেশি ছুটে যাওয়া সকল নামাযের কাযার হুকুম এক ও অভিন্ন।

দীর্ঘদিনের কাযা

বুখারী শরীফে এসেছে-

وقال ابراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে রেখেছে সে ওই এক ওয়াক্তেরই কাযা করে নেবে। (বোখারী শরীফ, হাদীস নং- ৫৯৭ দ্র.)

এতে বোঝা গেল যে দীর্ঘদিনের পুরাতন হলেও কাযা করতে হয়। তাই কেউ যদি বলে, ২০, ৩০, ৪০ বছরের ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা লাগবে না, শুধু তাওবা করলেই চলবে, তাহলে সেটা ভুল হবে।

বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারীতে বলা হয়েছে–

قوله :فليصل اذا ذكرها) اعم من ان يكون ذكره اياها بعد النسيان بعد شهر او سنة او اكثر من ذلك

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রা.) বলেন, চাই এক মাস পরে মনে পড়ুক অথবা এক বছর বা এর চেয়ে বহুদিন পরে মনে পড়ুক হুকুমটি ব্যাপক। (উমদাতুল কারী ৫/৯২)

তিনি আরো বলেন,

فيه الامر بقضاء الناسى من غير اثم و كذلك النائم سواء كثرت الصلاة او قلت وهذا مذهب العلماء كافة

অর্থাৎ, নামাযের সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক, এর কাযা করতে হবে।

এটা সকল ওলামায়ে কেরামের মাযহাব (উমদাতুল কারী ৫/৯৩)

প্রসিদ্ধ ফক্বীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম (রা.) বলেন

فالاصل فيه ان كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فانه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا او سهوا اوبسبب نوم وسواء كانت الفوائت قليلة او كثيرة

মূল কথা হচ্ছে, যেকোনো নামায তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তে ছুটে গেলে তার কাযা আবশ্যক। ইচ্ছায় ছেড়ে দিক বা অনিচ্ছায় অথবা ঘুমের কারণে। তার সংখ্যা কম হোক বা বেশি। (আল বাহরুর রায়েক ২/১৪১)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (রহ.) ফতওয়া

সকল ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনের সাথে একমত পোষণ করে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন -

ومن عليه فائتة فعليه ان يبادر الى قضاء ها على الفور سواء فاتته عمدا او سهوا عند جمهور العلماء

যার জিম্মায় ছুটে যাওয়া নামায থাকবে তার কর্তব্য হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব তার কাযা করে নেয়া। চাই ওই নামায ইচ্ছাকৃত ছেড়ে থাক বা ভুলক্রমে। এটাই সকল উলামাদের মত। (মজমূআতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া -২৩/২৫৯)

এ-সংক্রান্ত একটি জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন,

المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة اولى من الاشتغال عنها بالنوافل ـ ـ ـ

নফল নামাযে সময়ক্ষেপণ করার চেয়ে দীর্ঘদিনের ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করার প্রতি মনোনিবেশ করা উত্তম। (ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ২২/১০৪)

মোট কথা, পুরো উম্মত এ কথার ওপর একমত যে ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন, আর তা ইচ্ছাকৃতই ছাড়া হোক না কেন,

সঠিকভাবে হিসাব করে এর কাযা করা আবশ্যক। কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য

বিশ্লেষণ করে সকলেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহতে এমন কোনো দলিল নেই, যাতে দীর্ঘদিনের কাযা বা স্বেচ্ছায়কৃত কাযার অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যায়। তাছাড়া অল্প হলে কাযা করতে হবে, আর বেশি নামায ছাড়লে কাযা লাগবে না–এটা হাস্যকরও বটে। যদি সেটা মেনেও নেয়া হয়, তবে এই স্বল্প আর বেশির পরিমাণ কে নির্ণয় করবে? এ ঘোষণা কে দেবে যে, এত ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়ার পর থেকে আর কাযা করতে হবে না। এমন আজগুবি কথা কিছুতেই কুরআন-সুন্নাহসম্মত হতে পারে না। যে নামায প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ওপর কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা ফরজ হয়েছে তা বাতিল বা মওকুফ করার জন্যও অকাট্য প্রমাণ লাগবে। অথচ এমন দুর্বল কোনো দলিলও নেই, যার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, নামায যা অকাট্য দলিল দ্বারা ফরজ হয়েছিল ব্যক্তিগত অবহেলা বা গাফিলতির কারণে সেই ফরজ বিধানটি বাতিল হয়ে গেছে। অতএব যারা এ কথা বলে, দীর্ঘদিনের নামায ছেড়ে দেয়া হলে তার কোনো কাযা নেই, শুধু তওবা করাই যথেষ্ট তাদের এমন উক্তি কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিপরীত একটি ভ্রান্ত মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

কাযা ও তাওবা

অনিচ্ছায় ছুটে যাওয়া নামাযের একমাত্র কাফফারা হচ্ছে কাযা পড়ে দেয়া। কিন্তু স্বেচ্ছায় ও অবহেলায় ছেড়ে দেয়া নামাযের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরেকটি করণীয় রয়েছে। আর তা হচেছ কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। কেননা যথাসময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হুকুম পালন না করা একটি বড় অন্যায়। আজানের আওয়াজ শুনেও সাড়া না দেয়া চরম ধৃষ্টতা। তাই কাযার দ্বারা ছেড়ে দেয়া নামায পূরণ করে দিতে হবে আর দেরিতে পূরণ করার জন্য তাওবা করতে হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই ওয়াক্ত নামাযকে একত্রে আদায় করল সে কবিরা গুনাহের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটিতে প্রবেশ করল। (তিরমিযী ১৮৮)

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, কাযা করা সত্ত্বেও দেরি করার কারণে কবীরা গুনাহ হয়েছে। তাই কাযার সাথে সাথে তাওবা করাও জরুরি। যাতে করে কাযার দ্বারা ছেড়ে দেয়ার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আর তাওবার দ্বারা দেরি করার গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

শুধু তাওবা যথেষ্ট নয় :

কুরআন-সুন্নাহ ও গোটা উম্মতের ইজমার বিপরীত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উদ্ভট সিদ্ধান্ত হলো ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়া নামাযের কোনো কাযা নেই। শুধু তাওবা করাই যথেষ্ট। তারা নাকি এমন কাযা নামাযের কোনো দলিল খুঁজে পায় না। কিন্তু তাদের না পাওয়া তো বাস্তবে দলিল না থাকার প্রমাণ হতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল থাকা সত্ত্বেও যেমনটি শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, না পাওয়ার দাবির প্রকৃত কারণ কী? সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এই ভ্রান্ত মতবাদের পুরোধা সিদ্দিক হাসান বলেন :

বিনা ওজরে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করতে হবে কি না, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুর তথা অধিকাংশের মতে কাযা করা আবশ্যক। তাঁরা এর সপক্ষে দলিলও পেশ করে থাকেন। কিন্তু আমি কুরআন-সুন্নাহে তাদের কোনো দলিল খুঁজে পাইনি.....। (আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/১৩১)

এখানে তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়া নামাযের কাযা বিগত দেড় হাজার বছরের জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে আবশ্যক। তাহলে উম্মতের সর্বসম্মত পথ-মত ছেড়ে ভিন্নমত গ্রহণের অবকাশ কোথায়? উম্মতের মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ এ মাসআলাটি দলিল ছাড়াই কি আমল হয়ে এল? এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই ইসলামের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টির একটি হীন চক্রান্ত।

তাওবার স্বরূপ

তাওবার বাস্তবতা আমাদের জানা থাকতে হবে। তাওবা দ্বারা ছোট-বড় সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাওবা দ্বারা ফরয মাফ হয় না। যেমন যদি দীর্ঘদিন রমজানের রোযা না রাখে তাহলে তাওবা দ্বারা মাফ হবে না। ঠিক নামাযের ফরয বিধানের বিষয়টিও তাই। সময়মতো আদায় করা না হলে পরে কাযা করে দিতে হবে। শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হবে না। এটা আল্লাহ তা'আলার হক। হাদীস শরীফে এসেছে–

আল্লাহর পাওনা অধিক আদায়যোগ্য। (বুখারী ১৯৫৩)

মোট কথা, যে সকল ইবাদতের বদল শরীয়তে ঠিক করে দিয়েছে, তা আদায়ের সামর্থ্য থাকাবস্থায় শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হবে না। তাওবা কবুলের পূর্ব শর্ত হিসেবে তার কাফফারা বা হক আদায় করে দিতে হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৩৮)

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (রহ.) বলেন–

(قوله بل بالتوبة) اى بعد القضاء امابدونه فالتاخير باق فلم تصح التوبةمنه،لان من شروطهاالاقلاع عن المعصية كمالايخفى (سعيد كمپنى)

ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দেয়া কবিরা গুনাহ, যা শুধু কাযার দ্বারা মাফ হবে না বরং কাযার পরে তাওবাও করতে হবে। যদি কাযা ছাড়া শুধু তাওবা করা হয়

তবে নামায অনাদায়ী থাকার কারণে তার তাওবা কবুল করা হবে না। কেননা এ কথা স্পষ্ট যে গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসা তাওবা কবুলের অন্যতম শর্ত (শামী-২/৬২)

উমরী কাযা আদায়ের পদ্ধতি

ওয়াক্ত মতো নামায আদায়ে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ওয়াক্তে কাযা করার সময় তরতীব বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করবে অতঃপর ওয়াক্তের ফরয নামাজ আদায় করবে। খন্দকের যুদ্ধে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই তরতীবেই ছুটে যাওয়া নামায আদায় করেছিলেন। তবে যদি সময় স্বল্পতার কারণে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে প্রথমে ওয়াক্তের নামায আদায় করবে, অতঃপর কাযা পড়বে।

ছুটে যাওয়া নামায যদি ছয় ওয়াক্তের অধিক হয় তবে এই তরতীব বহাল থাকবে না। যেকোনো ওয়াক্তের কাযা আগে পরে আদায় করতে পারবে এবং ওয়াক্তিয়া নামায যথারীতি আদায় করতে থাকবে।

কাযা আদায়ের ফলে যদি ছয় ওয়াক্তের নিচে নেমে আসে তবে উক্ত তারতীব পুণর্বহাল হবে। সেক্ষেত্রে সাহেবে তারতীবের নিয়ম মেনে নামায আদায় করতে হবে।

কাযা নামাযের পরিমাণ বেশি হওয়ার দরুন সঠিক পরিসংখ্যান সম্ভব না হলে যথাসম্ভব খুব চিন্তা-ফিকির করে সঠিক হিসাব বের করার চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কেহ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে মাঝে মাঝে নামায আদায় করেছে। অধিকাংশ নামাযই ছুটে গেছে। এভাবে ৪-৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এখন সে নামাযগুলো আদায় করতে চায়। তাহলে তাকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত এবং সাথে বিতিরের নামায যোগ করে ৪-৫ বছরের নামায কাযা আদায় করতে হবে। সতর্কতামূলক কিছু বেশি আদায় করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন কারো ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণ মনে না থাকলে যথাসম্ভব হিসাব করে কিছু বেশি পরিশোধ করে দেয়া হয়।

জীবদ্দশায় কাযা নামায আদায় করে শেষ করে যেতে হবে। অসুস্থ বা দুর্বল হলে ইশারায় হলেও আদায় করতে হবে। যদি একেবারে অপারগ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে ফিদইয়া আদায়ের অসিয়ত করে যেতে হবে। মৃত্যুর পূর্বে ফিদইয়া আদায় করা যাবে না। ওসিয়ত করে গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে নামাযের ফিদইয়া আদায় করা ওয়ারিশদের কর্তব্য হবে। ফিদইয়ার পরিমাণ হচ্ছে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য পৌনে দুই সের গম/আটা বা তার মূল্য গরিব-মিসকিনকে সদকা করা। বিতিরের নামাযও গণনা করতে হবে। এ হিসাবে এক দিনের নামাযের ফিদইয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় সারে দশ সের গম/আটা বা তার মূল্য ।

ফিদইয়া আদায়ের অসিয়ত করে না গেলে ওয়ারিশদের ওপর আদায় বাধ্যতামূলক নয়। তবে তারা স্বেচ্ছায় আদায় করে দিলে ক্ষমার আশা করা যায়। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, খণ্ড ৪)

কোনো দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি এমন ঘটে অর্থাৎ অবহেলায় নামায না পড়ে জীবন পার করে দেয়। অনুশোচনা আসার পর মৃত্যুসজ্জায় কাযা আদায়ের শারীরিক সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুর পর ফিদইয়া আদায়ের মতো আর্থিক সংগতিও না থাকে। তবে তার জন্য একটি পথ মাত্র খোলা থাকে। আর তা হচ্ছে তাওবা। খাটি মনে বিগত দিনের ভুলের জন্য তাওবা করে মরতে পারলে পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের কাছে মাফ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তিনি চাইলে দয়া করে মাফও করে দিতে পারেন। তবে এই আশায় ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে ঈমানহারা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৩৩৮)

প্রচলিত ভুল :

আমাদের সমাজে যেভাবে একদল লোক উমরী কাযা নেই বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে, অন্যদিকে একদল উমরী কাযার মনগড়া কিছু পদ্ধতির কথাও বলে যাচ্ছে। বিভিন্ন বই-পুস্তকে উমরী কাযা বলতে বিশেষ দিনে বিশেষ পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের হাদীস মুহাদ্দিসীনের মতে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) মওযুআত গ্রন্থে লেখেন–

حديث من قضى صلاة من الفرائض فى آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره الى سبعين سنة باطل قطعا ، لانه ناقض للاجماع على ان شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات (الموضوعات الكبرى ٣٥٦)

যে ব্যক্তি রমজানের শেষ শুক্রবার একটি ফরজ নামায কাযা পড়ে নেবে তার বিগত সত্তর বছরের ছুটে যাওয়া সকল নামাযের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। (মওযুয়াতে কুবরা ৩৫৬)

অনুরূপ আল্লামা শাওকানী (রহ.) লেখেন–

حديث من صلى فى آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة فى اليوم والليلة قضت عنه ما اخل به من صلاة سنة، هذا موضوع لا اشكال فيه (الفوائد المجموعة ١/٥٤)

যে ব্যক্তি রমজানের শেষ জুমু'আ বারে রাত-দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়

করবে তার বিগত এক বছরের নামাযের সকল ত্রুটির কাযা হয়ে যাবে।" এই হাদীসটি বানোয়াট এতে কোনো সন্দেহ নেই। (আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআ ১/৫৪)

এ ধরনের আজগুবি কথাকে বানোয়াট হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করতে দেখে অনেকে ভুল বুঝেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, উমরী কাযা বিষয়টিই মূলত ভিত্তিহীন। পেছনের জীবনে ছেড়ে দেওয়া বা ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা লাগবে না। যেহেতু এগুলো মওজু হাদীস। অথচ বাস্তব সম্পূর্ণ এর বিপরীত। মুহাদ্দিসগণ উমরী কাযার এই শর্টপদ্ধতিকে মনগড়া বলেছেন। উমরী কাযাকে নয়। তাই দীর্ঘদিনের ছুটে যাওয়া নামাযকে কাযা নামায নাম দেয়া হোক বা উমরী কাযা, সর্বাবস্থায় তা হিসাব করে আদায় করে দিতে হবে। তাওবা দ্বারা বা বিশেষ দিবসের নামায দ্বারা তার কাফফারা আদায় হবে না।

বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত আকীদা :

যারা দীর্ঘদিনের ছেড়ে দেওয়া নামাযের কাযা লাগবে না, শুধু তাওবা করলে চলবে বলে, তারা মূলত একটি বিকৃত আকীদার ভিত্তিতে এটা বলে থাকে। তাদের মতে, ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে কাফের মুরতাদ হয়ে যায়। বিধায় পুনরায় তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করাই যথেষ্ট, কাযা আদায় করতে হবে না। এই ভ্রান্ত মতবাদের গুরু অহিদুজ্জামান হায়দারাবাদী লেখেন–

ومن ترك الصلاة متعمدا كفر وهل يجب عليه القضاء ام لا فيه قولان وتجب عليه التوبة بالاتفاق فان لم يتب يجب قتله (كنز الحقائق ٣١)

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেছে। তার ওপর কাযা ওয়াজিব হবে কি না, এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। তবে সর্বসম্মত মতানুসারে তার ওপর তাওবা ওয়াজিব। যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (কানযুল হাকায়েক ৩১)

তাদের আরেক মান্যবর আলেম মাওলানা সিদ্দীক হাসান লেখেন–

ومحل الخلاف هو الصلوة المتروكة بغير عذر عمدا، واقول حكمه مافى الاحاديث الصحيحة،" امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ويقيم الصلوة ويوتو الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله الا بحقه" ومن لم يفعل فلا عصمة لدمه ومالـه بل نحن مامورون بقتاله كما امر رسول الله ﷺ والمقاتلة تستلزم القتل (الروضة الندية ١٣١)

বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামায-সংক্রান্ত আলোচনায় আমি বলব, এর হুকুম সহীহ হাদীসে এভাবে এসেছে- আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাইহা ইল্লাহ' বলে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, বাইতুল্লাহর হজ্ব করে এবং রমজানের রোযা রাখে। যে ব্যক্তি এগুলো পালন করবে সে তার জানমাল নিরাপদ রাখবে, তবে ইসলামের কোনো হক নষ্ট করলে তা ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এগুলো পালন করবে না, তার জানমালে কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। বরং আমরা তার সাথে লড়াইয়ে নির্দেশিত। যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) ছিলেন। আর লড়াইয়ের অনিবার্য ফল হত্যা। (রওযাতুন নাদিয়্যা ১৩১)

অর্থাৎ তাঁর মতে, বেনামাযী কাফের সে তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে। এই ভ্রান্ত আকীদার কারণেই এই দলের লোকেরা সারা দেশে একযোগে বোমা ফাটিয়ে নিষিদ্ধ দলে পরিণত হয়েছে। বেনামাযীকে হত্যা তাদের মতে বড় জিহাদ। এটা হাদীসের অপব্যাখ্যার বিষফল।

মোট কথা, যারা বলে দীর্ঘদিনের ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা লাগে না, তারা মূলত বেনামাযীকে কাফের মনে করে এবং তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করে। আর তাওবা করলে যেহেতু নতুনসূত্রে মুসলমান হলো তাই পেছনের সকল পাপ মোচন হয়ে গেছে। কাযা নামায পড়া লাগবে না। এই বিকৃত আকীদাটি তারা সচরাচর প্রকাশ করে না। পাছে তাদের অনুসারী আবার কমে যায় কি না ।

হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা

امرت أن أقاتل الناس الخ এই হাদীসটি বিভিন্ন শব্দগত পার্থক্যসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। মূলত কোনো অমুসলিমকে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করার কিছু আলামত এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আলামতসমূহ পাওয়া গেলে সে একজন মুসলমানের মতো জানমালের নিরাপত্তা পাবে। যেমন তিরমিযী শরীফের বর্ণণায় এসেছে–

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ، و يأكلوا ذبيحتنا ، وأن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم مالـلمسلمين و عليهم ماعلى المسليمن (ترمذى٢٧٣٥)

উক্ত হাদীসে মুসলমানের চারটি নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। (১) ঈমানের শাহাদাত (২) মুসলমানদের কেবলা অনুসরণ (৩) মুসলমানদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ (৪) মুসলমানদের মতো নামায আদায়। হাফেজ আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় লেখেন–

-(وأن يصلوا صلاتنا) أى كما نصلى ولا توجد إلا من موحد معترف بنبوته ، ومن اعترف به فقد اعترف بجميع ما جاء به ، فلذا جعل الصلاة علماً لاسلامه (تحفة الا حوذى ٢٨٥/٢)

''আমাদের নামায পড়বে" অর্থাৎ আমরা যেভাবে নামায পড়ি। এমন নামায কেবল একাত্মবাদী ও নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াতে বিশ্বাসীর কাছে আশা করা

যায়। আর যে নাকি তাঁর নবুওয়াতকে মেনে নিল সে যেন তাঁর আনীত সকল বিধিবিধানই মেনে নিল। তাই নামাযকে তার ইসলামের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। (তোহফাতুল আহওয়াজি ৭/২৮৫)

অতএব এই হাদীস মতে যারা মাঝে মাঝে নামায পড়ে, সপ্তাহে একবার জুমু'আর নামায আদায় করে তাদের মাঝেও ওই প্রতীক বিদ্যমান থাকায় মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। তাকে কাফের-মুরতাদ মনে করে হত্যা করা যাবে না।

এই হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দীর সাথে পড়াকে নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়নি বরং মুসলমানের মতো নামায পড়াকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যথায় ويأكلوا ذبيحتنا "মুসলমানদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণে"র অর্থ কী হবে? দু-একবার মুসলমানদের জবাইকৃত পশু খাওয়া কি নিদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়? নাকি পাবন্দীর সাথে সর্বদা খেতে হবে। সামনে এলে কখনো যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না খায় তবে কি সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে? বাস্তবে যেহেতু এমন নয়, নামাযের বেলায়ও এমন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত, এই হাদীসে أقاتل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা المقاتلة ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر) থেকে নির্গত হয়েছে। القتل এবং المقاتلة এর অর্থ এক নয়। المقاتلة অর্থ পরস্পর লড়াই করা আর القتل এর অর্থ হচ্ছে হত্যা করা। তাই হাদীস দ্বারা লড়াই প্রমাণিত হয়। হত্যা প্রমাণিত হয় না। অতএব এই হাদীস থেকে বেনামাযী মুসলমানের হত্যার বৈধতা মেলে না।

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কথাটি এভাবে লেখেন–

قلت لا يصح هذا الاستدلال لان المامور به هو القتال، ولا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل، لان باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين، ولا كذلك القتل فافهم ـ (عمدة القارى ١/٢٧٣)

একই কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী (রহ.) তিনি লেখেন–

وعلى هذا ففى الإ ستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلا نظر، للفرق بين صيغة اقاتل واقتل ـ والله أعلم ـ(فتح البارى١/٩٦)

তাছাড়া ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারীকে হত্যা করার বৈধতা প্রমাণের জন্য যারা এই হাদীস পেশ করে, তারা তো কেউ যাকাত না দিলে তাকে হত্যার কথা বলে না। অথচ হাদীসে নামায ও যাকাত উভয়টার কথা বলা হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের হাদীসে আছে–

امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحق الا سلام و حسابهم على الله ـ(بخارى ٢٥)

হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগের একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। এক অঞ্চলের লোক তার খেলাফত আমলের শুরুর দিকে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের নিকট লোক পাঠিয়ে বোঝানের চেষ্টা করলেন এবং যথারীতি যাকাতের হুকুম এখনো বহাল আছে বলে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তারা এ কথায় কর্ণপাত তো করলই না, উল্টো লড়াইয়ের জন্য ময়দানে নেমে এল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ঘোষণা দিলেন-

والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الخ (ترمذى ٢٧٣٤)

আল্লামা মোবারকপুরী (রহ.) লেখেন–

وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذر هم با لجهل لا نهم نصبوا القتال فجهز اليهم من دعا هم إلى الرجوع فلما اصروا قاتلهم ـ(تحفةالاحوذى٧/٢٨٣)

বোঝা গেল যে, যাকাত না দেয়ার কারণে যুদ্ধ ছিল না বরং অস্বীকার করে প্রতিরোধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেছিলেন। এটাই হাদীসের বর্ণিত المقاتلة শব্দের অর্থ মতে সঠিক আমল। তাই দেখা যায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যাকাত না দেয়ার কারণে কাউকে বন্দি করে হত্যা করেননি। যারা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল শুধু তাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিয়ে ছিলেন। অতএব কেউ নামায রোযা বা ইসলামের কোনো বিধান স্বেচ্ছায়, অবহেলায় ছেড়ে দিলে তাকে কাফের-মুরতাদ বলে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো মুসলমান এর জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তবে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো মুসলিম শাসকের একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে ।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন–

وسئل الكرمانى ههنا عن حكم تارك الزكاة ثم أجاب :بأن حكمهما واحد و لهذا قاتل الصديق رضى الله عنه ما نعى الزكاة، فإن أراد أن حكمهما واحد فى المقاتلة فمسلم ـ وان اراد فى القتل فممنوع لان الممتنع من الزكاة يمكن ان تؤخذ منه قهراً ـ بخلاف الصلاة، اما اذا انتصب صاحب الزكاة للقتال لمنع الزكاة فإنه يقاتل، و بهذه الطريقة قاتل الصديق رضى الله عنه ما نعى الزكاة، و لم ينقل انه قتل أحداً منهم صبراً ـ (عمدة القارى ١/٢٧٣)

বেনামাযী কাফের নয়

যারা বলে দীর্ঘদিনের কাযা পড়া লাগে না, তাওবা করলেই চলে। তারা একটি হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। হাদীসটি হচ্ছে–

من ترك صلاة متعمداً فقد كفر (بدر المنير ٧/تلخيص)

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল। (তালখীস ২/১৪৮)

উল্লিখিত হাদীসটি বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তাতে না থাকা সত্ত্বেও তারা এটাকে দলিল হিসেবে পেশ করে

থাকে। বুখারীর কথা বলে মুখে ফেনা তুললেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য কিতাবের দ্বারস্ত হয়ে থাকে। এটা ওদের এক প্রকার ধোঁকা। এই হাদীসে বর্ণিত فقد كفر কুফুরী বলতে তারা ধর্মত্যাগী হওয়া বুঝিয়ে থাকে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। কুফুরের বিভিন্ন অর্থ এবং স্তর রয়েছে। কুফুর মানে শুধু ধর্মত্যাগ নয়। যেমন বুখারী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে–

قال النبى صلى الله عليه وسلم :أريت النار فإذا أكثر اهلها النساء يكفرن، قيل :أيكفرن بالله ؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان ، لو احسنت إلىٰ احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت :ما رأيت منك خيراً قط (بخارى)

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। অধিকাংশ জাহান্নামী নারী। তারা কুফুরী করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারা স্বামীর নাফারমানী করে এবং এহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করো অতঃপর কখনো তোমার পক্ষ থেকে সামান্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় তবে বলে উঠবে, তোমার কাছে আজীবন ভালো কিছু পেলাম না। (বুখারী ২৯)

ইমাম বুখারী (রা.) এই হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন باب كفران العشير ''স্বামীর অবাধ্যতা এবং কুফুরের স্তর বিন্যাস।'' তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, কুফুরী শব্দের অর্থ শুধু আল্লাহর কুফুরী নয় বরং গুনাহকেও কুফর বলা হয়, আর তখন ওই কুফুরীর উদ্দেশ্য ধর্ম ত্যাগ হয় না । স্বামীর অবাধ্যতাকে এই হাদীসে কুফুরী বলা হয়েছে এ অর্থেই। অর্থাৎ এটা বড় ধরনের পাপ। বোঝা গেল কুফরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) লেখেন–

قال القاضى ابو بكر بن العربى فى شرحه :مراد المصنف ان يبين ان الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصى تسمى كفراً ، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة قال :وخص كفران العشيرمن بين انواع الذنوب (فتح البارى ١/١٠٤)

অতএব নামায ত্যাগের হাদীসের মাঝে যে কুফুরীর কথা বলা হয়েছে, সেখানেও কুফুরী দ্বারা কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র গুরুত্ব বোঝাবার জন্য রূপক অর্থে কুফুরী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেভাবে স্বামীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীন এ হাদীসের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (রহ.) বলেন–

التاخير بلاعذر كبيره (الدرالمختار مع الرد ٢/٦٢)

"বিনা ওজরে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ।" (আদ্দুররুল মুখতার)

হাদীস শরীফে আসেছে–

فمن تركها فقد كفر (ترمذى)

"যে নামায ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।" (তিরমিযী)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন–

أى أظهر الكفر وعمل عمل أهل الكفر (مرقات ٢/٢٥٨)

অর্থাৎ সে কুফুরীর বহিঃপ্রকাশ করল এবং কাফেরদের মতো আচরণ করল । (মেরকাত-২/২৫৮)

এক হাদীসে এসেছে-

ولا تترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة (ابن ماجه٤٠٣٤)

"ইচ্ছাকৃত ফরজ নামায ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত তা ছেড়ে দেবে তার ব্যাপারে কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না।" (ইবনে মাজাহ ৪০৩৪)

আল্লামা ত্বিবী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন

كناية عن الكفر تغليظا (مرقاة ٢/٢٦٢)

ভীতি প্রদর্শনের জন্য রূপক অর্থে কুফুরী বলা হয়েছে। (মিরকাত ২/২৬২)

তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে–

كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة (ترمذى ٢٧٥٧)

সাহাবায়ে কেরাম একমাত্র নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেয়াকে কুফুরী মনে করতেন না। (তিরমিযী -২৭৫৭)

মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন–

أن ترك صلاة عندهم كان من أعظم الوزر وأقرب إلى الكفر (مرقاة ٢/٢٦٢)

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামায ছেড়ে দেয়া বড় গুনাহ এবং প্রায় কুফুরের মতো ছিল। (মেরকাত ২/২৬২)

আল্লামা শাওকানী (রহ.) নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে কুফরের স্তর বিন্যাস মেনে নিয়ে বলেন-

لأن نقول لايمنع أن يكون بعض انواع الكفر غير مانع من المغفرة و استحقاق الشفاعة ككفر اهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها الشارع كفراً(تحفة الاحوذى ٧/٣١١)

কুফুরের কোনো কোনো প্রকার এমন থাকাটা অসম্ভব নয়, যা ক্ষমা ও শাফায়াত লাভে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন মুসলমানদের কুফুরী, যা এমন কতক গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে শরীয়াতে যেগুলোকে কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছে। (তোহফাতুল আহওয়াজি ৭/৩১১)

অর্থাৎ নামায ত্যাগের ব্যাপারে যে কুফুরীর কথা বলা হয়েছে তা এমন পর্যায়ের নয়, যার দরুন ক্ষমা অসম্ভব হয় এবং শাফায়াত থেকে চির বঞ্চিত

হতে হয়। কুফুরের মাঝে স্তর রয়েছে এটাই বাস্তব এবং সকলে এ বিষয়ে একমত। বিধায় স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগকারীর কুফুরী নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম ত্যাগকারীর মতো কুফরী নয়। এ কারণেই বিভিন্ন হাদীসে নামায ত্যাগ করাকে কুফরী না বলে শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং কবীরা গুনাহ আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে,

خمس صلوات افترضهن الله تعالىٰ ـ من احسن وضوء هن و صلاهن لوقتهن و اتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له ـ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفرله وان شاء عذبه (احمد ، ابوداود، مشكوة ٥٧٠)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে ওয়াক্ত মতো ওই নামাযগুলো আদায় করবে। রুকু ও খুশুখুজু ঠিকমতো পুরা করবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য ক্ষমার ওয়াদা থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবে না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য কোনো রূপ ওয়াদা নেই। তিনি চান তো মাফ করে দেবেন অথবা শাস্তি দেবেন।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, মেশকাত ৫৭০)

অপর হাদীসে আছে–

من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر (ترمذى ١٨٨)

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করল সে কবীরা গুনাহের দরজাসমূহের মধ্য হতে একটিতে প্রবেশ করল। (তিরমিযী ১৮৮)

বোঝা গেল, বেনামাযী কাফের হয়ে যায় না বরং গুনাহাগার ও ফাসেক হয়। কুফুর যেমন অমার্জনীয় অপরাধ, এটা ওই পর্যায়ের কুফর নয়। এখানে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। বেনামাযী কাফেরের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং ক্ষমা ও শাফায়াত সেও পাবে। যারা ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারীরকে কাফের বলে তারাও এ ব্যাপারে একমত। তাহলে এই মতানৈক্যের ফলাফল আর কিছু বাকি থাকে না। বিধায় নামায কাযা করা লাগবে না শুধু তাওবা করলে চলবে এমন কথার আর কোনো ভিত্তি থাকে না।

বেনামাযী চির জাহান্নামী নয় :

আল্লামা মোবারক পুরী (রহ.) আল্লামা শাওকানীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারী কাফের তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং শাফায়াত পাবে এ কথা উল্লেখ করার পর লেখেন–

قلت لو تأملت فى ما حققه الشوكانى فى تارك الصلاة من انه كافر وفى ما ذهب اليه الجمهور من انه لا يكفر ، لعرفت انه نزاع لفظى ، لانه كما لايخلد هو فى النار و لا يحرم من الشفاعة عند الجمهور كذلك لايخلد هو فيها و لايحرم منها عند الشوكانى ايضا۔(تحفة الاحوذى٧/٣١١)

অতএব নামায ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়া সত্ত্বেও যদি সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী না হয় তাহলে সে কাফের হলো কী করে? তাকে কিছুতেই কাফের ধরে নিয়ে কাযা নামায মওকুফ করা যাবে না।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ফতোয়া

سئل رحمه الله عن تارك الصلاة من غير عذر ، هل هو مسلم فى تلك الحال ؟ فأجاب :اما تارك الصلاة :فهذا ان لم يكن معتقدا لو جوبها فهو كافر بالنص والاجماع ـ (مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ٢٢/٤٠)

জিজ্ঞাসা : বিনা ওজরে নামায ত্যাগকারী ওই অবস্থায় মুসলমান থাকে কি?

জবাব : নামায পরিত্যাগকারী যদি নামাযকে ফরয বলে বিশ্বাস না করে তবে সে নস এবং ইজমার ভিত্তিতে কাফের। (মজমুআতু ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/৪০)

তিনি আরো বলেন–

لكن أكثر الناس يصلون تارة ، و يتركونها تارة ، فهؤ لاء ليسوا يحافظون عليها ، وهؤلاء تحت الوعيد ـ وهم الذين جاء فيهم الحديث الذى فى السنن حديث عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفرله (مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ٢٢/٤٩)

তবে অধিকাংশ লোক কখনো নামায পড়ে কখনো ছেড়ে দেয়। এরা নামাযে পাবন্দী করে না। এ ধরনের লোক ধমকির আওতাভুক্ত। এদের ব্যাপারেই মূলত হযরত উবাদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রযোজ্য। নবীজি (সা.) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপর রাত-দিনে ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলোর ওপর পাবন্দী করবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা রয়েছে। পক্ষান্তরে যে এগুলোর পাবন্দী করবে না, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো ওয়াদা নেই। তিনি যদি চান আযাব দেবেন অথবা মাফ করে দেবেন।" (মজমুয়াতু ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২২/৪৯)

বোঝা গেল, নামায অস্বীকার করে ত্যাগকারী কাফের আর অবহেলায় স্বেচ্ছায় ত্যাগকারী কাফের নয় বরং ফাসেক। তার ব্যাপারে কঠিন সাজার ভয় আছে।

অতএব উমরী কাযা নেই তাওবাই যথেষ্ট এটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। তদ্রূপ উমরী কাযার নামে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু নামায আদায়ের প্রচলনটিও মনগড়া। হিসাব করে কমবেশি ছুটে যাওয়া সকল নামাযের কাযা আদায় হচ্ছে শরীয়তের বিধান।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

মাওলানা আব্দুল্লাহ
সাতগাঁও, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা-১

খতমে তারাবীহ পড়ে হাফেজ সাহেবকে কিভাবে হাদিয়া দেয়া জায়েয হবে?

সমাধান-১

হাফেজ সাহেবকে খতমে তারাবীহর উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেওয়া কোনোভাবেই জায়িয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৭৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১৪)

জিজ্ঞাসা-২

আমাদের এলাকায় মহিলারা বোরকা পরে নিজ গ্রাম ও এর আশপাশের গ্রামের মহিলাদের সহযোগিতায় টাকা-চাল চাঁদা করে ১০-১২ জন বক্তা দাওয়াত করে দুই দিনের তাফসীর মাহফিল করে এবং প্রায় ১০০ লোকের উন্নত খানার ব্যবস্থা করে। সব কিছু হয় মহিলাদের অর্থায়নে ও তাদের ব্যবস্থাপনায়। এখন প্রশ্ন, জাহেলা মহিলাদের ব্যবস্থাপনায় তাফসীর মাহফিল শরীয়তে কি হুকুম রাখে?

সমাধান-২

যে জরুরতে মহিলাদেরকে পর্দার সাথে বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে, তাফসীর মাহফিলের চাঁদা আদায় উক্ত জরুরতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের ব্যবস্থাপনায় তাফসীর মাহফিল শরীয়তসম্মত নয়। (রুহুল মা'আনী ১৮/১৪০)

জিজ্ঞাসা-৩

আমাদের এলাকায় দ্বীনের আগ্রহে প্রতি পাড়ায় দুই-তিন দিনব্যাপী তাফসীর মাহফিল হয় মাহফিলগুলোতে অনেক মাইক ব্যবহার করা হয়। রাত ১-২ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। মাইকের আওয়াজে গভীর রাতেও মানুষ ঘুমাতে পারে না, অনেকের ফজর নামায কাযা হয়। কোনো কোনো আলেম বলেন, রাত ১০টা-১১টার পর মাহফিল করা ইযায়ে মুসলিম বিধায় নাজায়িয? শরীয়তের হুকুম জানতে চাই।

সমাধান-৩

শরীয়তের কোনো বিধান পালনে ত্রুটি ও মানুষের কষ্ট না হয়–এমন পদ্ধতিতে তাফসীর মাহফিলের ইন্তেজাম করা জরুরি। (ফতহুল বারী ১/১৯)

জিজ্ঞাসা-৪

দিন-তারিখ ঠিক করে গ্রামের ৩০-৪০ জন মহিলা একত্রিত হয়ে একেক দিন একেক বাড়িতে (খতমে) দু'আ ইউনূসের খতম করে এবং ওই মহিলারাই সালাতুত তাসবীহ কোনো এক বাড়িতে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে কোথাও জামআতে আবার কোথাও যার যার নামায আদায় করে। শরীয়তে কি এর অনুমতি আছে?

সমাধান-৪

খতমে ইউনূস ও নফল নামায জামআতে পড়ার জন্য মহিলাদেরকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (আল বাহরুর রায়িক ১/৬২৮)

প্রসঙ্গ : আযান

মুহা. আবুল হাশেম
বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

নামাযের আযান শেষে দু'আ করার সময় দু'হাত তুলে মনে মনে দু'আ করা যাবে কি? এ বিষয়ে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী?

জিজ্ঞাসা-২

তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতি দিয়ে "দৈনন্দিন যিকির ও দু'আর সমাহার" নামক ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আযান ও ইকামতের মাঝে নিজের জন্য দু'আ করবে, কেননা ওই সময় দু'আ প্রত্যাখ্যান হয় না' এ ক্ষেত্রে আযান শেষে আমরা কী পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজের জন্য দু'আ করতে পারি?

সমাধান-১

আযান শেষে মাসনুন দু'আটি হাত তোলা ছাড়া পড়বে। (ফয়জুল বারী ২/১৬৭, এমদাদুল ফাতাওয়া ১/১৬৪)

সমাধান-২

হাদীস শরীফে আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ কবুল হওয়ার কথা রয়েছে বিধায় দু'হাত তুলে বা না তুলে যেকোনভাবে দু'আ করার মাধ্যমে তার ওপর আমল করতে পারেন। (আবু দাউদ শরীফ ১/৭৭)

প্রসঙ্গ : শবে কদর, শবে বরাত

মুহা. আব্দুল আহাদ ফরিদী
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

জিজ্ঞাসা :

বাংলাদেশি এক ভদ্রলোক সৌদি আরব থাকেন। তিনি বলেন, শবে কদর ও শবে বরাত উদ্‌যাপন করা যাবে না। কারণ, নবী (সা.)-এর দেশে শবে বরাত, শবে কদর পালন করা হয় না। অন্যদিকে বাংলাদেশের সকল মুসলমান এমনকি আলেম-ওলামাগণও তা পালন করেন। প্রশ্ন হলো, কুরআন-হাদীসে উক্ত রাতগুলোতে ইবাদত বন্দেগী করার প্রমাণ আছে কি?

সমাধান :

শবে কদর ও শবে বরাতে আমল করার ফযীলত কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে তা সম্মিলিত বা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নয়। অবশ্য উক্ত রাত্রিদ্বয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন কুপ্রথার সংমিশ্রণ দেখা যায়, যা বর্জনীয়। (সূরা ক্বদর, বুখারী শরীফ ১/২৭০, তিরমিযী শরীফ ১/১৫৬)

প্রসঙ্গ : কুড়ানো বস্তু

মুহা. শাহাদাত হুসাইন
রাজারচর, শিবচর, মাদারীপুর।

জিজ্ঞাসা :

সম্প্রতি আলেমগণ বলেন, মুমিনের জন্য দুষ্টু লোকের হস্তগত হওয়ার পূর্বে হারানো বস্তু তুলে নেয়া উচিত। কারণ সে বস্তুটির উপযুক্ত মালিককে তা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবে অথবা কোনো গরিব-মিসকীনকে তা সদকা করবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমদের কথা কি সঠিক? না হলে কোনো করণীয় আছে কি না? যদি সে নিজেই গরিব হয় তাহলে কি ওই বস্তু সদকা না করে নিজে ব্যবহার করতে পারবে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

সমাধান :

হারানো বস্তু তার মালিককে নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উঠিয়ে উত্তম। তবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে উঠিয়ে নেয়া ওয়াজিব, আর নিজের ওপর আস্থা না থাকলে উঠানো জায়েয নেই। যথাযথ খোঁজাখুঁজির পরও মালিক পাওয়া না গেলে উক্ত পড়ে পাওয়া বস্তু সদকা করে দেবে। তবে ওই ব্যক্তি নিজে গরিব হলে সে নিজেই ব্যবহার করতে পারবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৬৪-৩৬৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৪-৪৩৫)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা. আব্দুল করীম
ডুমনি, খিলক্ষেত, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদরাসা বানানোর বিধান কী? মসজিদের জন্য প্রায় ১০০ শতক জায়গা ওয়াকফ করা হয়। তারপর মসজিদ কমিটি ৫ শতকের মধ্যে মসজিদ করে। অনেক দিন পর বাকি জায়গাতে একটি দাখিল মাদরাসা করে এবং একটি মাঠও রাখে। বর্তমানে মাদরাসার প্রয়োজনে ওই মাঠের কিছু অংশে টয়লেটের ট্যাংকি করতে চায়। সুতরাং প্রশ্ন হলো, মসজিদের জায়গাতে বানানো মাদরাসার হুকুম কী হবে? উক্ত মাদরাসা কি উঠিয়ে দেয়া হবে, নাকি মসজিদের উন্নয়নকাজে তা ভাড়া দিয়ে রেখে দেয়া হবে?

সমাধান :

মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গায় মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয নেই। সুতরাং মসজিদের জায়গায় মাদরাসা বানানো অবৈধ হয়েছে। তবে মাদরাসাটি উঠিয়ে দিতে হবে না বরং উক্ত জায়গার ন্যায্য ভাড়া মসজিদের ফান্ডে আদায় করবে এবং মাদরাসার প্রয়োজনে মসজিদের মাঠে ভাড়া আদায় করার মাধ্যমে টয়লেটের ট্যাংকি বানানো বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, যেকোনো সময় মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে জায়গাটি খালি করে দিতে হবে। (আদ্দুররুল মুখতার১/৩৯০)

প্রসঙ্গ : সরকারি আইন লঙ্ঘন

মুহা. ফিরোজ হোসেন
ডেমরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি বেসরকারি কারখানায় চাকরিরত। এখানে গ্যাসের অফিস থেকে শিল্প-কারখানার গ্যাসের লাইন আছে। আর সরকারি আইন হলো, এই গ্যাস শুধু কারখানার কাজেই ব্যবহার করতে পারবে। রান্নাবান্না করার অনুমতি নেই। এতদ্বসত্তেও কারখানার মালিক সরকারি কর্মকর্তার অগোচরে রান্না করে থাকে। আর এ রান্নাকৃত খানা সে নিজে ও শ্রমিকরা খায়। তবে গ্যাসের মিটার রিডিং অনুযায়ী নিয়মিত বিল পরিশোধ করে থাকে। জানার বিষয় হলো, এতে শরীয়তের কোনো সমস্যা আছে কি না?

সমাধান :

সরকারি আইন শরীয়ত পরিপন্থী না হলে নাগরিকের জন্য তা পালন আবশ্যক। বিধায় বিল আদায় করা সত্ত্বেও উক্ত পন্থা অবলম্বন অনুচিত। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১৭/৩৭৪)

প্রসঙ্গ : পাওনা পরিশোধ

মাওলানা নো'মান
ইমাম, টেক্সটাইল মসজিদ, শ্যামপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি যাত্রাবাড়ী থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার কথা বলে তুরাগ বাসে উঠি। উত্তর বাড্ডা এসে বাসের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়ায় সকল যাত্রীকে নামিয়ে দেয়া হলো। প্রশ্ন হলো, সুপারভাইজারের সাথে আমাকে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেয়ার চুক্তি সত্ত্বেও মাঝপথে এসে নামিয়ে দেয়ার কারণে আমার ওপর অর্ধেক রাস্তার ভাড়া দেয়া জরুরি কি না? তারা যাত্রীদের কারো কাছ থেকেই অর্ধেক পথের ভাড়া না চাওয়ায় আমি বাড্ডা পর্যন্ত ভাড়া তাদেরকে না দিয়েই চলে এসেছি। এই কাজ আমার জন্য জায়েয হয়েছে কি না? যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে এখন আমার কী করণীয়? যেহেতু ওই টাকা পরিশোধের এখন বাহ্যিক কোনো উপায় নেই।

সমাধান :

বাড্ডা পর্যন্ত ভাড়া না দিয়ে চলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আপনার ওপর তা ঋণ হয়ে আছে। মালিকের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হলে মালিকের (নামে) পক্ষ থেকে সদকা করে দেবেন। (রদ্দুল মুহতার ৬/১৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৩৯০)

প্রসঙ্গ : খতনা

মুহা. শরীয়তুল্লাহ
সোনাগাজী, ফেনী।

জিজ্ঞাসা-১

ইসলামে খতনা করানোর হুকুম কী এবং উক্ত বিষয়ে পুরুষ ও মহিলার বিধান কি এক ও অভিন্ন?

জিজ্ঞাসা-২

আমাদের দেশে খতনা সাধারণত ডাক্তারের মাধ্যমে করানো হয়। এখন প্রশ্ন হলো, খতনা করানোর সময় ডাক্তার যদি অনিচ্ছায় ভুলবশত লিঙ্গ কেটে ফেলে তাহলে ডাক্তারের ওপর দিয়্যাত কিংবা কোনো জরিমানা আসবে কি? সমাধান চাই।

সমাধান-১

ইসলামের দৃষ্টিতে খতনা পুরুষদের জন্য সুন্নাত আর মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৯/৩৫৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৭৫১)

সমাধান-২

অভিজ্ঞ ডাক্তারের অনিচ্ছায় বা ভুলবশত খতনার সময় লিঙ্গ কেটে গেলে তার ওপর কোনো জরিমানা আসবে না। পক্ষান্তরে ডাক্তার এ বিষয়ে পারদর্শী না হলে এবং লিঙ্গ কাটার কারণে ছেলেটা মারা গেলে ডাক্তারের ওপর অর্ধেক দিয়্যাত ওয়াজিব হবে। আর যদি মারা না যায় তাহলে যদি পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের পুরোটা কেটে যায় তাহলে পূর্ণ দিয়্যাত অর্থাৎ দশ হাজার দিরহাম (যা বর্তমান বাজারে ২৬২৫ ভরি রূপা) দিতে হবে। আর এর কম কাটা গেলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে এ ধরনের দুর্ঘটনা হলে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/২৭, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৫/২১৩)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা. তাজুল ইসলাম
বাইতুল আমান জামে মসজিদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি মসজিদের কী কী কর্মকাণ্ড হতে পারে? এবং কিভাবে কেমন ব্যক্তির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। মোতাওয়াল্লী বা সদস্যসচিব কাকে বলে। মোতাওয়াল্লীর সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক কী? ইমাম সাহেব যদি তার অবস্থানের জন্য দলীয়করণ করে চলে তা হলে মোতাওয়াল্লীর কর্তব্য কী? মসজিদ কমিটি গঠন করার দায়িত্ব কার ও কিভাবে? যদি অন্যান্য সদস্যের সাথে দ্বিমত দেখা দেয় তখন সে কী করতে পারে?

জিজ্ঞাসা-২

আমাদের বাড়ির মসজিদটি কম্পাস মোতাবেক কাবার সঠিক পশ্চিম দিক থেকে উত্তরে ৪০ ডিগ্রি ব্যবধান আর মাত্র ৫ ডিগ্রি হলে ঠিক উত্তর দিক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অত্র মসজিদে নামায পড়া কতটুকু সহীহ হবে। উভয়টির সমাধানের অনুরোধ রইল।

সমাধান-১

মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান। নামায, যিকির, তিলাওয়াত, ই'তিকাফ ও দ্বীনি কাজের জন্য নির্ধারিত। একজন দ্বীনদার মুত্তাকী নামাযী ব্যক্তির দ্বারা মসজিদ পরিচালনার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করবে। ইমাম সাহেবের নামাযসহ মসজিদ প্রাসঙ্গিক কাজে মুতাওয়াল্লী সার্বিক সহযোগিতা করবে। ইমাম সাহেব নিজস্ব কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবৈধ ও অনৈতিক দলীয়করণ, যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার কারণ হয় তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবেন। কমিটি গঠনের দায়িত্ব মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার। তার অনুপস্থিতিতে এলাকার মুসল্লীগণের। কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোনো দ্বিমত দেখা দিলে পরস্পর সমাধান করে নেবে। (রদ্দুল মুহতার ৪/৩৪৩,ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১৫/১৭১)

সমাধান-২

কোনো মসজিদের কেবলা সঠিক দিক থেকে ৪৫ ডিগ্রির বাহিরে হলে নামায সহীহ হবে না। উক্ত মসজিদটি যেহেতু ৪৫ ডিগ্রির ভেতরে রয়েছে তাই তাতে নামায সহীহ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার ১/৪২৯, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৩১৩)

প্রসঙ্গ : মিরাছ

মুহা. আইয়ুব ভূঁইয়া
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

আমার আব্বা-আম্মা বর্তমানে জীবিত আছেন। আমরা ৪ ভাইবোনের মধ্য থেকে আমার বড় ভাই ইউসুফ ভূঁইয়া ৫-৬ বছর আগে মারা গেছেন। আমার ভাইয়ের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে আছে। আমার ভাইয়ের ৪ জন সন্তান থাকা সত্ত্বেও আমার ভাইয়ের স্ত্রী অন্য এক ছেলের সাথে বিবাহ করেছে। এমতাবস্থায় আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমার আব্বার সম্পদের মিরাছ দাবি করে, আমার ভাইয়ের স্ত্রীর দাবি অনুযায়ী আমার আব্বার সম্পদে মিরাছ পাবে কি না?

সমাধান :

শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী শ্বশুরের সম্পদে পুত্রবধূর কোনো অংশ থাকে না বিধায় তার মিরাছের দাবি অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়। (রদ্দুল মুহতার ৮/৭৭৪)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুফতী জুলকার নাইন সুহাইল
আল মদিনা জামে মসজিদ, মহাখালী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

সরকারি জমিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ প্রায় ১৫ বছর ধরে জামে মসজিদ হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে সরকারি কর্মকর্তাগণ মসজিদের জায়গা বাদ দিয়ে বাউন্ডারিওয়াল নির্মাণ করেন। এমতাবস্থায় মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? এবং মসজিদটির বর্তমানে দোতলার ছাদ

নির্মাণের কাজ চলছে। এমতাবস্থায় নিচের তলায় মার্কেট বানানো জায়েয হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, জামে মসজিদটি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে জামে মসজিদ হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে এতে সরকার কর্তৃক বাধা না দেওয়া এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ মসজিদের জায়গা বাদ দিয়ে বাউন্ডারিওয়াল নির্মাণ করা তাদের পক্ষ থেকে অনুমতিরই প্রমাণ। তাই উক্ত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। কোনো জায়গায় শরয়ী মসজিদ হওয়ার পর পাতাল থেকে আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে, তার কোনো অংশে মসজিদের আয়ের জন্য হলেও মার্কেট ইত্যাদি বানানোর অনুমতি নেই। (আল বাহরুর রায়িক্ব ৫/৪১১, খাইরুল ফাতাওয় ২/৭৯৩)

প্রসঙ্গ : ব্যবহৃত পানি

মাওলানা আসলাম উদ্দীন
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

খানা খাওয়ার পর হাত ও প্লেট ধোয়া পানি ماء مستعمل কি না? এবং অনেককে দেখেছি তা খেয়ে ফেলে। আমার জানার বিষয় হলো তা খাওয়া যাবে কি না?

সমাধান :

প্লেট ধোয়া পানি কখনো ماء مستعمل তথা ব্যবহৃত পানি হিসেবে গণ্য হবে না। তা পান করতে কোনো আপত্তি নেই। হ্যাঁ, উভয় হাত সুন্নাত মতে কবিজ পর্যন্ত ধোয়া হলে ওই পানি ماء مستعمل তথা ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হওয়ায় তা খাওয়া যাবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪১৫)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. মোস্তফা কামাল আহমদ
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

পুরুষ-নারী জামাআতে নামায আদায় করার সময় ইক্তিদার নিয়ত করতে হবে কি না?

(২) ইমাম সাহেব যখন সূরা পড়বেন তখন ইমাম সাহেবের সাথে সূরা ফাতেহা পড়া বাধ্যতামূলক কি না?

(৩) মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি কি পুরুষদের থেকে ভিন্ন? কোনো কোনো ব্যক্তি বলেন, পুরুষ এবং মহিলাদের নামায তথা রুকু, হাত বাঁধা ও সিজদা একই রকম হবে।

সমাধান-১

নারী-পুরুষ সকলের জন্য জামাআতে নামায আদায় করার সময় ইমামের ইক্তিদার নিয়ত করা জরুরি। তবে মহিলাদের জন্য জামাআতে নামায আদায় করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং তারা ঘরের অন্দর মহলে আদায় করবে। (রদ্দুল মুহতার ১/৪২৪)

সমাধান-২

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পেছনে সূরা ফাতেহা ও ক্বিরাত পড়া নিষেধ। (সূরা আল আ'রাফ-৮, মুসলিম শরীফ ১/২১৫)

সমাধান-৩

মহিলাদের নামায পুরুষের নামায থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন, যা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যথা : মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের ওপর স্বাভাবিকভাবে রেখে বুকের ওপর হাত বাঁধবে। রুকুতে পুরুষের তুলনায় কম ঝুঁকবে। সিজদায় অত্যন্ত জড়সড় ও সংকুচিত হয়ে সিজদা করবে। উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে ইত্যাদি। (মুসন্নাফে আব্দুর রজ্জাক ৩/১৩৭, রদ্দুল মুহতার ১/৫০৪)

প্রসঙ্গ : পানীয়

মুহা. মুঈনুদ্দীন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের বাংলাদেশে টাইগার নামে যে পানীয় বিক্রি করা হয় তা পান করা জায়েয কি না?

সমাধান :

বর্তমানে দেশে প্রচলিত পানীয়দ্রব্য কোকাকোলা হোক বা টাইগার যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম বা নেশাজাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ নিশ্চিত হবে না, এ-জাতীয় পানীয় ব্যবহার করাকে নাজায়েয বলা যাবে না। পক্ষান্তরে হারাম বা নেশাজাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ নিশ্চিত না হলেও সতর্কতামূলক তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪৬০, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/২০৩)

প্রসঙ্গ : হাউস লোন

মুহা. আব্দুল্লাহীল কাফি
কলেজ রোড, আলমনগর, রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

দুই বছর পূর্বে আমার বাবা আমাদের ভাইদের রংপুর শহরের সেন্টার পয়েন্টে বাড়ি তৈরির জন্য এক কোটি টাকা দেন। কিন্তু এক কোটি টাকা যথেষ্ট না হওয়ায় আমরা সরকারি HBFC থেকে ৬০ লাখ টাকা লোন গ্রহণ করি, যা লাখে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা কিস্তি হিসাবে ১৫ বছরে পরিশোধযোগ্য। বর্তমানে আমার বাবা বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত যে, সুদের সংস্পর্শ যে বাড়িতে সে বাড়িতে তিনি থাকতে অনিচ্ছুক। আমার প্রশ্ন হলো, সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সহযোগিতা নিয়ে বাড়ি করা দোষের কি না?

সমাধান :

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সুদদাতা, গ্রহীতা, লিখক, সাক্ষীগণ সব আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপে অভিশপ্ত। সুদের

নিম্নস্তরের গুনাহ নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। তাই পারতপক্ষে সুদি লেনদেন থেকে বিরত থাকা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। হাউস বিল্ডিং কর্তৃত গৃহীত লোনও সুদের আওতাভুক্ত, যা প্রশ্নপত্রে বর্ণনায় সুস্পষ্ট যে, ১৫ বছরে অতিরিক্ত ৪৮ লাখ টাকা আদায়যোগ্য। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাদের পাওনা পরিশোধ করে কৃত অন্যায় ও গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করে নিতে হবে। এতে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তির আশা করা যায়। (মিশকাতুল মাসাবীহ-২৪৪, ফাতাওয়া রহিমিয়া ২/১৯৩)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. মাসরুর হোসেন ভূঁইয়া
বাড়ি-৩৫, রোড-৭, ব্লক-জি
বনানী, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : ১

আমার বাবা ডাইলেসিস রোগী তার রক্ত প্রতি ১ দিন পর পর পরিষ্কার করতে হয়। এতে সময় লাগে ৬ ঘণ্টা। পুরো সময় তাকে শুয়ে থাকতে হয়। ওই সময়ের নামাযগুলো তিনি কিভাবে পড়বেন? বর্তমানে তাকে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করাচ্ছি।

জিজ্ঞাসা : ২

কোনো সুদি কোম্পানি যেমন : ব্যাংক, বীমা, লিজিং, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের শেয়ার না কিনে শুধু রিয়েল এস্টেট, ওষুধ কোম্পানির শেয়ারের ব্যবসা করা যাবে কি?

সমাধান : ১

শরীয়তের আলোকে আপনার বাবার ডাইলেসিস চলাকালীন এক ওয়াক্ত নামাযের পুরো সময় অতিবাহিত হলে সে মাযুর বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ওই ওয়াক্তের নামায আদায় করার জন্য পানি দ্বারা উযু করা ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে, বসে বসে নামায পড়া সম্ভব না হলে শুয়ে শুয়ে কেবলামুখী হয়ে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৪১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৫১)

সমাধান : ২

শরীয়তের আলোকে চারটি শর্ত সাপেক্ষে যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয যথা : ১. কোম্পানির মূল কারবার হালাল হওয়া। ২. লিখিত মূল্যের চেয়ে কমবেশিতে বিক্রয়ের জন্য কোম্পানির পণ্য শুধু নগদ না হওয়া বরং তা সম্পদে পরিণত হওয়া। ৩. কোনো অপারগতায় কোম্পানি সুদি লেনদেনে জড়িত হয়ে পড়লে সুদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করা। ৪. কোম্পানির আয়ে সুদ অন্তর্ভুক্ত হলে লভ্যাংশের সে পরিমাণ সদকা করা। উল্লিখিত চারটি শর্ত রিয়েল এস্টেট বা ওষুধ কোম্পানিতে পাওয়া গেলে উক্ত কোম্পানি দুটির শেয়ারের ব্যবসা করা যাবে। অন্যথায় যাবে না। (ফেক্বহী মাকালাত ১/১৫১)

তবে এটিও লক্ষ্যনীয় যে, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় শরয়ী নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কি না? যদি শরয়ী নীতিমালা অনুসরণ না করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তবে চারটি শর্ত পাওয়া যাওয়া সত্বেও এ ধরণের লেনদেন বৈধ হবে না।

প্রসঙ্গ : টাই পরিধান

মুহা. ফখরুল ইসলাম
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

মুসলমানদের জন্য টাই পরার বিধান কী? জনৈক ব্যক্তি বলেন, টাই না পরার কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই বিধায় তা বৈধ হবে। তথাপি তা ইহুদি-খ্রিস্টানদের আবিষ্কৃত বলে নাজায়েয বলা যাবে না। কারণ বর্তমানে আমরা ইহুদি, খ্রিস্টানদের আবিষ্কৃত অনেক পণ্য ব্যবহার করে থাকি এবং তা জায়েযও বটে। তেমনিভাবে টাই তাদের আবিষ্কৃত হলেও ব্যবহার করা যাবে। বিশেষভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের নামে কোট, টাই, প্যান্ট পরে লোকসমাগমে বক্তব্য দেয় তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

সমাধান:

টাই মূলত খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় প্রতীক। অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বনের ব্যাপারে শরীয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিধায় টাই না পরার কথা কুরআন-হাদীসে নেই–এমন মন্তব্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাছাড়া অমুসলিমদের আবিষ্কৃত পণ্যের সাথে টাইকে তুলনা করা অবান্তর। কেননা এগুলো তাদের ধর্মীয় প্রতীক নয়। বিজাতীদের পোশাক পরে ইসলামের প্রচার আসলে একটি ধোঁকা। মুসলিম সমাজে তাদের কালচার সহনীয় করার একটি অপকৌশল। ইসলামের দাওয়াত হতে হবে সুন্নাত তরীকায়, মনগড়া পদ্ধতিতে নয়। (সুনানে আবী দাউদ ২/৫৫৯, মিরকাতুল মাফাতীহ ৮/১৫৫, এমদাদুল আহকাম ৪/৩৪০)

প্রসঙ্গ : ফরমালিন

আব্দুল্লাহ
ধানমন্ডি, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা : বর্তমানে প্রায় সব ধরনের খাবারে ফরমালিন মেশানো হচ্ছে। ফরমালিনের একটি উপাদান হচ্ছে এ্যালকোহল। এমতাবস্থায় এসকল খাবার খাওয়া যাবে কি না?

সমাধান : মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার ফরমালিনযুক্ত খাবার বর্জনের নির্দেশ দিলে তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। ফরমালিনে এ্যালকোহলের মিশ্রন নিশ্চিত নয়। যদি বাস্তবে থেকেও থাকে তবে যেহেতু এসকল দ্রব্যে আঙ্গুরি শরাবের ব্যবহার না হওয়া নিশ্চিত করা হয়েছে তাই এ ধরনের এ্যালকোহলযুক্ত খাবার খেতে পারবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ২/৯৫)

ইসলামে মানবাধিকার-৩

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

৬. ব্যক্তিগত অধিকার :

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের প্রবর্তক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া উঁকি ঝুঁকি করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। তাঁর এই আদেশ পবিত্র কুরআনের সূরায়ে হুজরাত ১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। একে অপরের গোপনীয়তা ও ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুপ্রবেশ না করার শিক্ষা দিয়েছেন। মূলত যে সমাজে ব্যক্তিগত বিষয়াদির সম্মান করা হয় না, তাতে নানাবিদ ফেতনার আশংকা থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (সূরা আন-নূর ২৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হবে, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন নূর ৫৮)

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বকীয় গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ابى هريرةؓ قال قال رسول الله ﷺ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة۔

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মুমিনের কষ্ট লাঘব করেছে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তার কষ্ট দূর করবে এবং যে লোক দুনিয়ায় মুসলমানের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তার গোপনীয়তা সংরক্ষণ করবেন। (সহীহে মুসলিম ৪/২০৭৪, হা. ২৬৯৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/৩২৭, হা. ২৬৫৬৭, সুনানে আবী দাউদ ৪/২৮৭ হা. ৪৯৪৬, তিরমিযী ৪/৩৪ হা. ১৪২৫ ইত্যাদি)

عن سالم، عن ابيه ان رسول الله ﷺ قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔

হযরত সালেম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। না তার ওপর জুলুম করে, না কোনো জালেমের হাতে সোপর্দ করে। যে মুসলমান তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে কেউ নিজ মুসলমান ভাইয়ের কষ্ট দূর করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার কষ্ট দূর করবেন এবং যে তার মুসলমান ভাইয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। (সহীহে বোখারী ২/৮৬২ হা. ২৩১০, সহীহে মুসলিম ৪/১৯৯৬, হা. ২৫৮০, সুনানে আবী দাউদ ৪/২৭৩ হা. ৪৮৯৩ ইত্যাদি)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا

তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা, অন্যের দোষ আবিষ্কার করো না, অন্যের গুপ্তচরবৃত্তি করো না। কারো সাথে হিংসাপরায়ণ হয়ো না এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহীহে বুখারী ৫/২২৫৩, হা. ৫৭১৭, সহীহে মুসলিম ৪/১৯৮৫, সুনানে আবী দাউদ ৪/৩০৩ হা. ৪৯১৭ ইত্যাদি)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام۔

কারো সাথে শত্রুতা রেখো না, কারো

প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, কারো গীবত তথা সমালোচনা করো না, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। নিজ মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। (সহীহে বুখারী ৫/২২৫৩ হা. ৫৭১৮, সহীহে মুসলিম ৪/১৯৮৩ হা. ২৫৫৯, আবু দাউদ ৪/৩০১ হা. ৪৯১১, ৪৯১০ ইত্যাদি)

উল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসসমূহ থেকে অনুমান করা যায় ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা সম্পর্কে কতটুকু যত্নবান। যেহেতু উল্লিখিত বিষয়সমূহের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার খর্ব হয়, গোপনীয়তা অরক্ষিত হয়ে যায় এবং এর কারণে সমাজে সমূহ ফেতনা-ফেসাদের আশংকা থাকে সে কারণে ইসলাম কঠোরভাবে এসব নিষেধ করে দিয়েছে। এসব ইসলামেরই স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, যা অন্য কোনো রীতিনীতিতে পাওয়া যায় না।

৭। নিরাপত্তার অধিকার

ইসলাম মানেই নিরাপত্তা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যেসমূহে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান আপন নামের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ মুসলমানগণ নিজের পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য সম্পূর্ণই নিরাপদ। ইসলাম একদিকে যেমন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য কঠোর দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তেমনি মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, নিজের কথা, কাজ ও আচরণের কারণেও যেন অন্যের নিরাপত্তাবলয় ব্যাহত না হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

মুসলমান তারাই, যাদের মুখ এবং হাত দ্বারা কেউ কষ্ট না পায়। (সহীহে বুখারী ১/১৩ হা. ১০, ৫/২৩৭৯ হা. ৬১১৯, সহীহে মুসলিম ১/৬৫, হা. ৪১, তিরমিযী ৫/১৭ হা. ২৬২৬ ইত্যাদি)

হযরত আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন–

قالوا يارسول الله اى الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ইসলাম সর্বোত্তম? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, (ওই মানুষের ইসলামই সর্বোত্তম) যার মুখ এবং হাত থেকে (এর কষ্ট থেকে) অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (সহীহে বুখারী ১/১৩ হা. ১১, সহীহে মুসলিম ১/৬৬ হা. ৪২ ইত্যাদি)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন–

ان رجلا سأل رسول الله ﷺ اى الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف

এক সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে জিজ্ঞেস করেন, কোন প্রকারের ইসলাম উত্তম? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, অন্যকে আহার করাও এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (সহীহে বুখারী ১/১৯ হা. ২৮, সহীহে মুসলিম ১/৬৫ হা. ৩৯, আবু দাউদ ৪/৩৫০, হা. ৫১৯৪ ইত্যাদি)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্য ওই বস্তু কামনা করবে না, যা তুমি নিজের জন্য কামনা করো। (সহীহে বুখারী ১/১৪ হা. ১৩, সহীহে মুসলিম ১/৬৭ হা. ১৩, তিরমিযী ৪/৬৬৭ হা. ২৫১৫ ইত্যাদি)

উল্লিখিত ইসলামের মূলনীতিগুলো দুনিয়ার যেকোনো সমাজে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। সাথে সাথে পরস্পর সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ গঠনেও এর চেয়ে সুন্দর মূলনীতি আর হতে পারে না।

৮. সামাজিক সমঅধিকার :

ইসলাম সকল মানুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে। বর্ণ, বংশ, ভাষা, সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য রাখেনি ইসলাম। এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রত্যেক লোকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমান অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী, সকল মানুষ একজন পুরুষ ও নরী থেকে জন্ম নিয়েছে। সুতরাং একই মাতা-পিতার সন্তানদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য করা যায় না। সুতরাং সকল মানুষ মানুষ হিসেবে সমান অধিকারই প্রাপ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير

হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত ১৩)

হজ্জাতুলবেদার সময় সাহাবায়ে কেরামের ইজতিমায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

الا لا فضل لعربى على عجمى ولا

لـعجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى۔

নিশ্চয় কোনো আরবের অনারবের ওপর, কোনো অনারবের আরবের ওপর এবং কোনো শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের ওপর, কোনো কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের ওপর পরহেজগারী ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (মুসনাদে আহমদ ৫/৪১১ হা. ২৩৫৩৬, বায়হাকী ৪/২৮৯, হা. ৫১৩৭ ইত্যাদি)

সার্বিক বিষয়ে ইসলামের সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার প্রমাণ এসব বৈপ্লবিক মূল নীতিমালা। ইসলাম কোনো লোককে বর্ণ, দেশ, ভাষা–কিছুর ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেনি। দান করেনি অর্থ, বংশ ইত্যাদি বিবেচনায়ও। বরং ইসলামে মানুষ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বিবেচিত হয় তাকওয়া তথা পরহেজগারীর ভিত্তিতে। তাও আল্লাহর কাছে।

তবে ব্যক্তিযোগ্যতা, অবদান, কৃতিত্ব ও মেহনতের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। তার ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে মানুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে যে স্তর বিন্যাস হবে, সে হিসেবে পরস্পরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে তাদের সাথে আচরণ করতে হবে। সেটা ভিন্ন একটি অধিকার এবং ভিন্ন বিষয়, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মানুষ হিসেবে কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

ইসলামের এমন বৈপ্লবিক চেতনার বাস্তব অনুশীলনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন হাবশী গোলামকে মুআযযিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন। একজন কৃতদাস হযরত যাইদের সাথে বিয়ে দেন হযরত যায়নব বিনতে জাহাশের। রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে হযরত উসামা (রা.)-কে সেনাপ্রধান করা হয়।

ইসলামের এই সমান অধিকার ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, মুসলিম, জিম্মি, পুরুষ ও নারী সবার জন্য প্রযোজ্য।

৮. আইনি অধিকার :

ইসলামের উল্লিখিত সমান অধিকার সামাজিকভাবেই বিবেচিত তা নয় বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইনিভাবেও এই অধিকার প্রাপ্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের অধিকার সমান। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নাগরিকদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য নেই ইসলামে। বরং যাবতীয় দণ্ডবিধি সবার ওপর সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় এরূপ সমান আইন প্রয়োগের বহু বাস্তব ঘটনা কিতাবাদীতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। নিচে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

عن حسن بن محمد بن على قال: سرقت امرأة قال عمرو: حسبت انه قال: من بنات الكعبة ، فاتى بها النبى ﷺ فجاء عمر بن ابى سلمة فقال للنبى ﷺ انها عمتى، فقال النبى ﷺ لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা চুরি করেছে। আমর বলেন, আমার মনে পড়ে সে বলেছিল সে কুরাইশের সম্মানিত বংশের লোক। তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আনা হলো। তখন উমর ইবনে আবী সালাম এলেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, সে আমার ফুফি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করে, যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও হতো আমি তার হাত কেটে দিতাম। (সহীহে বুখারী ৩/১২৮২ হা. ৩২৮৮, ৩/১৩৬৬, হা. ৩৫২৬, সহীহে মুসলিম ৩/১৩১৬ হা. ১৬৮৯ ইত্যাদি)

আরেকটি হাদীসে এসছে–

عن ابى ليلى عن ابيه قال كان اسيد بن حضير رجلا ضاحكا مليحا قال فبينما هو عند رسول الله ﷺ يحدث القوم ويضحكهم فطعن رسول الله ﷺ باصبعه فى خاصرته فقال او جعتنى قال اقتص قال يارسول الله ان عليك قميصا ولم يكن على قميص قال فرفع رسول الله ﷺ قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بابى انت وامى يارسول الله اردت هذا

আবু লায়লা নিজ পিতাসূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উসাইদ ইবনে হুজাইর অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। একদা তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে লোকদের নিয়ে হাস্যরস করছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের আঙুল মোবারক দিয়ে তার কোমরে চাপ দিলেন। তখন তিনি ব্যথার কথা বললেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে এর বদলা নিয়ে নাও। তখন তিনি বললেন হে রাসূলাল্লাহ! আপনি জামা পরিহিত, অথচ আমি জামা পরিহিত ছিলাম না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা মোবারক উঠালেন। তখন উসাইদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে কোমর মোবারকে চুমু খেতে লাগলেন এবং বললেন হে রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কোরবান হোক–আমি এটাই চেয়ে ছিলাম।

এতে বোঝা যায়, স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে, নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন কাউকেই আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। যৎসামান্য বিষয়েও প্রযোজ্য শাস্তির প্রয়োগ করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন দুই জাহানের জন্যই করুণা বা রহমতস্বরূপ। দুনিয়ায় তাঁর মতো রহমত শফকত ও করুণার আধার কেউ হয়নি, নেই এবং হবেও না। দোষীদের শাস্তি প্রদান করুণা পরিপন্থী নয় বরং তা-ই প্রকৃত রহমত। যাতে একের কারণে পুরো সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
“আল-আবরার” এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩